বিচিত্র হৃদয়

প্রতিভা বসু

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

বিচিত্র হৃদয়

প্রতিভা বসু

প্রণীত

মাধবীর জন্য

মনোলীনা

সুমিত্রার অপমৃত্যু

বিচিত্র হৃদয়

কবিতাভবন কর্তৃক প্রকাশিত

সৌরেন সেন-কে

গুণীজনোচিত

খণ্ড কাব্য

বিচিত্র হৃদয়

অন্তহীন

একটি ভূমিকা করা দরকার মনে হ'লো। এ-বইটিতে যে-চারটি গল্প সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এরা আসলে একই গল্পের নানা ভঙ্গি। সমস্ত গল্পগুলো ভাঙালে তা থেকে মাত্র একটিই উপাদান বেরোবে। যাঁরা পড়বেন তাঁদের প্রতি এই আমার একটি আশা রাখলাম যে একই উপাদান সত্ত্বেও এরা যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রস সৃষ্টি করেছে এ যেন তাঁরা উপভোগ করতে পারেন। অবশ্যি এই সৃষ্টি সফল কিনা সেটা আমার বিচার্য নয়—এটুকুই শুধু বলতে পারি যে চেষ্টা করেছি। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও বলা দরকার যে এ-চেষ্টা আমার সচেতন মনের নয়। এর প্রথম গল্পটি ('গুণীজনোচিত') ১৩৫১ সালের বৈশাখীতে বেরিয়েছিলো। লিখেছিলাম তার আগের বছর। আমি যত গল্প লিখেছি—এ-ধরনের গল্প এর আগে লিখিনি—লিখিনি মানে এ নয় যে চেষ্টা ক'রে পারিনি, এ-ও নয় যে 'লিখলে হয়' ধরনের কোনো কথা আমার মনে হয়েছে, কারো-না-কারো ফরমায়েস নিয়েই আমি সাধারণত গল্প লিখতে বসি, কাজেই কলম যখন কাগজে ছুঁইয়ে মাথা নিচু করি তখন এ-কথা ভাববার আর অবকাশ হয় না যে 'এ করলে কেমন হয়,' 'এ-রকম লিখে একবার দেখি না'—কোনখান থেকে কথা বেরিয়ে আসে আমি জানি না—শুধু এটুকু বুঝতে পারি যে যেখান থেকেই হোক, গুটিপোকা থেকে রেশমের মতো অবিশ্রান্ত কলমের মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসছে, কাগজের পরে কাগজ কালো-কালো অক্ষরে ভ'রে ওঠে—মনের মধ্যে কেবল একটা সুরের ছলছলানি অনুভব করি।

লেখা শেষ হবার পরে দেখলাম এই চারটি গল্পের মধ্যে একটি সুরই আমি নানা ভঙ্গিতে গেয়েছি—ধরা যাক এ আমার বেহাগ সুরের সাধ[illegible]ই রাগিণীর এই চারটি গান আজ আমি যাদের

শোনাতে বাসনা করেছি তাঁরা যদি চারটিকে চারটি গান হিশাবেই উপভোগ করেন, এর অন্তর্নিহিত রাগিণীকে সে-সময়ের মতো অন্তত ভুলে যান তাহ'লেই আমার এ-গান গাওয়া সার্থক।

এর দু'টি গল্প 'বৈশাখী'তে এবং দু'টি গল্প 'অলকা'য় বেরিয়েছিলো। নানা মতের নানা গুঞ্জন কানে এসেছিলো সে-সময়ে। ভালো লেগেছিলো কি মন্দ লেগেছিলো সে-কথা নয়—যাঁরাই পড়েছিলেন তাঁরাই যে (অবশ্যি চেনাশুনোর মধ্যে) এ নিয়ে কথা বলেছিলেন তা থেকেই আমার মনে হয়েছিলো যে এরা একেবারেই অপাংক্তেয় নয়। আর সেই ভরসাতেই এই চারটি গল্প আমি একত্রিত ক'রে একটি বইয়ের আকৃতিতে সকলের কাছে উপস্থাপিত করলাম।

২৪ পৌষ ১৩৫২

গুণীজনোচিত

আমি একজন অতিশয় সাধারণ যুবক। আমার জীবনে কোনো কল্পনার প্রসার নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ। মার্চেণ্ট আপিশে চাকরি করছিলাম। মামার মৃত্যুতে সামান্য কিছু টাকার অধিকারী হ'য়ে বসলাম। মামা অবিবাহিত ছিলেন—আমি তাঁর একমাত্র ভাগ্নে—এবং অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় আমাকে হ'তেই হবে, কেননা আমার মতো ছেলেরা স্বভাবতই স্তিমিত হয়, গুরুজনদের ভক্তি করে, এবং পাঁচজনের মনরক্ষার জন্য নিজের সর্বনাশ করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মামার সামনে সিগারেট খেতুম না, মাথা আঁচড়াতাম না, দাড়ি কামাতাম না—মামা আজকালকার দিনের সঙ্গে আমার তুলনা ক'রে খুশিতে অস্থির হ'য়ে যেতেন। সে-জন্যেই বোধহয় তাঁর লাইফ-ইনশিওরেন্সের পলিসি আমার নামেই এসাইন ক'রে রেখেছিলেন। একটু অসময়ে মরলেন তিনি, এবং তাঁর পাঁচ হাজার টাকার ইনশিওরেন্সের অধিকারী আমাকেই হ'তে হ'লো। আমি কি খুব খুশি হয়েছিলাম?. বরং টাকাগুলো নিয়ে কী করবো তাই ভেবেই আরো উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলাম। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিলো—অবশেষে একটি বাড়ি কিনে ফেললুম আমি। পাঁচ হাজার টাকায় কলকাতার মতো জায়গায় যে একটি বাড়ি পাওয়া যাবে এমন কল্পনাও আমি করিনি, কিন্তু পাওয়া গেলো। মামার টাকাটাও যেমন আমার পক্ষে দৈব, বাড়িটিও তেমনি দৈবের দয়া ব'লেই আমি মেনে নিলুম। আসলে বাড়িটির যিনি মালিক, তিনি বোধহয় কোনো কৌশলেই বাড়িটি আপন করায়ত্ত করেছিলেন, আর বাড়িটির প্রতি কী যেন কেন তাঁর একটা প্রকট বৈরাগ্য দেখতে পেলুম—ও যেন হাতছাড়া করতে পারলেই তিনি রক্ষা পান, এ-রকমই তাঁর মনের ভাব। পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজারই সই। আমার সুবিধে হ'য়ে গেলো।

বাড়িটি ছোটো, কিন্তু বড়ো সুন্দর। চারপাশে একটু-একটু জমি—আগাছার জঙ্গলে ভর্তি—তার মধ্যে ছড়ানো-ছিটোনো নানা রংয়ের বুনো ফুল। দেয়াল ঘেঁষে একটি লম্বা লিচু গাছ। আমার মন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো। মাত্রই তিন খানা ঘর, তবুও ঘুরে-ঘুরে দেখতে আমার অনেক সময় লাগলো। আমিই যে এই বাড়ির মালিক এ-কথা আমি এক মিনিটের জন্যও ভুলতে পারলুম না। আমার

বাড়ি, একান্তই আমার, এ-কথাটা যেন আমার বুকের মধ্যে গুনগুন করতে লাগলো। আমি মুহূর্তের জন্ম মনের মধ্যে একটা স্বপ্নের আবেশ অনুভব করলুম। আমি দেখতে পেলুম কোনো-একটি সলজ্জ শঙ্কিত আলতা-পরা পদক্ষেপে সমস্ত বাড়ি যেন ভ'রে উঠেছে। এতদিনে মনে হ'লো আমার বিবাহ করা দরকার।

আমি থাকতুম আমার এক দূর সম্পর্কীয়ের বাড়ি। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার এই দশা। কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনো চালাবার মতো সংস্থান আমার ছিলো না। কেননা আমার বাবা আমার শৈশবেই মারা যান এবং মা-র সামান্ত-কিছু গহনা ছাড়া আমার আর অন্ত-কোনো মূলধন ছিলো না। অতএব টিউশনি ক'রে হাত-খরচ আর পড়ার খরচ চালানো সম্ভব ছিলো, কিন্তু মেসের খরচ পোষাতো না। প্রথমবার এসে এক পিসতুতো বোনের বাড়ি ছিলুম, তারপর জ্যাঠতুতো কাকার—তারপর বর্তমানে মাসির দেওরের বাড়ি। এখন চাকরি করি, মেসে থাকতে পারতুম কিন্তু এ-ভদ্রলোক নিজে থেকেই আমাকে আপ্যায়িত করেছিলেন। খরচ অবিশ্যি দিতুম।

মামা মিলিটারিতে কাজ করতেন, মাঝেমাঝে ছুটি-ছাটায় আসতেন আমাদের দেখে যেতে—আমার নম্রতায় মুগ্ধ হতেন, আর তারপর তো এই ফল। আমার আর একদিনও দেরি করতে ইচ্ছে করলো না। সবাই আমার বোকামিতে অবাক হ'লো। সবাই বললো, 'বাড়িটা পরিষ্কার করিয়ে ভাড়া দাও, মোটা ভাড়া পাবে। আমার মন মানলো না। কী হবে অত টাকা দিয়ে। চিরকালই তো এর তার বাড়ি কাটলো। নিজের বাড়িতে নিজে থাকবো, এ আমার কতকালের স্বপ্ন, এই একটা ছোটো আকাঙ্ক্ষাকে আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না। মা-কে চিঠি লিখে দিলাম দেশে। তারপর সামান্ত একটু চুনকাম করিয়েই নিজের অতি স্বল্প সম্পত্তি—একটা ট্রাঙ্ক আর একটা সুটকেশ—নিয়ে একদিন সকালবেলা এসে উঠলাম এ-বাড়িতে। রবিবার ছিলো। সামনেই চায়ের দোকানে জলযোগ সেরে দুপুরবেলা ঘুরে-ঘুরে দুটো-একটা জিনিশ কিনে আনলুম—একটা চাকরের ব্যবস্থা ক'রে এলুম—একটা ক্যাম্পখাট পর্যন্ত। একটা কুঁজো—দুটো কাচের গ্লাশ—মনে ক'রে-ক'রে সংসারের টুকি-টাকি শেষ পর্যন্ত, অনেক-কিছুই এনেছিলুম মনে আছে। কোণের ঘরের দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে খাটটি পাতা হ'লো। কুলিটাকে বকশিষ দিয়ে বিছানা পাতিয়ে নিলুম। রাস্তার কল থেকে এক কুঁজো জলও এনে দিলো। এবার আমি হাত-পা ছড়ালুম বিছানার উপর। নিস্তব্ধ দুপুর—

লিচু গাছটা হাওয়ায় কাঁপছিলো—জানলা খুলে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার যে কী ভালো লাগলো। লিখতে জানি না, নইলে সমস্ত দুপুর ব'সে-ব'সে কবিতা লিখতুম। নিঃশব্দে আমার সুখের সময় গড়িয়ে গেলো, বিকেলে উঠে দরজায় তালা দিয়ে আবার বেরুলাম। রাত্রিবেলা ফিরলাম একেবারে সংসার নিয়ে। স্পিরিট স্টোভ, কেটলি, কাপ—চাল, ডাল, হাঁড়িকুড়ি—আমি যে কত কৃতী কাউকে দেখানো গেলো না, এই যা দুঃখ। তবু মনে-মনে মা-র কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলুম, তিনি আসবেন এবার তাঁর ছেলের সংসারে—ছেলের বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হ'য়ে বলবেন, 'তুই এতও পারিস?' খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছিলুম। খানিকক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলুম—বিছানাটা টান করলুম নিজের হাতে—তারপর এক সময়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আলো নিবিয়ে শুলুম এসে বিছানায়। একটু দূরে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছিলো, কোন-এক সময় তাও নিবে গেলো,—আমি নির্ঘুম চোখে চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে উপভোগ করতে লাগলুম নিজের বাড়ির আরাম। আস্তে-আস্তে সিগারেটটা শেষ হ'লো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না—কেন ঘুম ভাঙলো তাও জানি না—থমথমে নিঃশব্দ ঘরে চোখ মেলে আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম। ভূত সম্বন্ধে আমার মনে ইতিপূর্বে কোনো বিকার ছিলো না, তাই এই নিরালা নির্জন রাতে একলা একটি ঘরে আছি, এ নিয়ে তিলমাত্র উদ্বেগ ছিলো না আমার। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম আমার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ছোটো-ছোটো নরম-নরম পাতলা পা ফেলে-ফেলে একটি মেয়ে এগিয়ে এলো ভিতরে। কাঁধের দুই পাশে তার লম্বা-লম্বা কালো চুল বেয়ে পড়েছে, দুটি নিটোল সরু আর সাদা হাত বুকের উপর ন্যস্ত, হাওয়ার মতো হালকা শরীর নিয়ে আস্তে-আস্তে ঘরের মাঝখানটিতে এসে সে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো মেঝের উপর—দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো কান্নায়। তার কান্নার অনুচ্চারিত শব্দ আমার সমস্ত প্রাণ-মন মথিত করলো। আমার বুকের মধ্যেও যেন একটি কান্নার ঢেউ ব'য়ে গেলো। তার অব্যক্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি প্রাণপণে আমার সমস্ত শক্তিকে কণ্ঠে একত্রিত ক'রে রুদ্ধ গলায় বললুম, 'তুমি কে?' চমকে মুখ তুললো মেয়েটি। কান্নায় তার গাল ভেজা, দুঃখের গভীরতায় অতলস্পর্শী তার চোখ। আমি ভালো ক'রে এবার তার মুখ দেখলুম—কী বলবো সে-মুখকে? সে-মুখ কি সুন্দর? সে-মুখ কি অবিস্মরণীয়? সে মুখের আকর্ষণ কি অনিবার্য? তা তো নয়! কিন্তু সে-মুখ অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অচিন্ত্য! তাকিয়ে দেখতে-দেখতে আমার মনে

হ'লো আমার সমস্ত জীবনের সকল ইচ্ছা সকল কামনা যেন মূর্তি নিয়ে এসেছে আমার কাছে। সমস্ত দিন ধ'রে কি আমার অচেতন মন এই মেয়েটিকেই প্রার্থনা করেছিলো? আমি একটু ভয় পেলুম না, একটু অস্বস্তি বোধ করলুম না, কেবল মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে, আমার বুকের কম্পন দ্রুত হ'য়ে উঠতে লাগলো। মেয়েটি আমাকে দেখে আশ্চর্য হ'লো। কতক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো সেখান থেকে। এইবার সে আমার কাছে আসবে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো—কেমন একটা উত্তেজনায় আমি উঠে বসলাম বিছানায়, ভাঙা-ভাঙা গলায় আবার বললাম, 'তুমি কে?'

মেয়েটি এসে আমার বিছানা থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো, দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললো, 'আমি রাধা।' আমার মনে হ'লো তার কণ্ঠ বেয়ে যেন গান ঝ'রে পড়লো। কেমন একটা অদ্ভুত মধুর আওয়াজে ভ'রে উঠলো ঘর। ফাঁকা মাঠে ডাক দিলে যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তার সেই সঙ্গীতময় কণ্ঠও আমার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। আমি কথা বলতে পারলুম না। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সে আবার বললো, 'তুমি কে? তুমি কেন এসেছো? কেন আমার এই অতল দুঃখের তিলতম শান্তিটিও হরণ করছো তোমরা? আমাকে দয়া করো, দয়া করো—হে পৃথিবীর নিষ্ঠুর মানুষ—আমাকে দয়া করো।' তারপর সে দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো, পাখির মতো নরম হালকা শরীর সেই ক্রন্দনবেগে কেবল কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো।

আমি ব্যথিত হ'য়ে বললুম, 'শান্ত হও। তুমি কী চাও আমি জানি না—তোমার কোনো ইচ্ছার আমি অসম্মান করবো না—কিন্তু তুমি বলো তুমি কী চাও।'

মেয়েটি একটু আন্দোলিত হ'লো। হাতের পাতা থেকে মুখ তুলে বললো, 'আমি তো বলতেই চাই, কিন্তু কেউ শোনে না—আমাকে দেখলেই সবাই চীৎকার ক'রে ওঠে, সবাই পালিয়ে যায়—অথচ আমার মৃত্যুর আগে কত লোক আমাকে ভালোবাসতো—কত লোকের সংস্পর্শে আমি ধন্য হতাম। এই ঘর, এই বাড়ি, কত পদস্পর্শে একদিন মুখরিত ছিলো। এইখানে, ঠিক এই জানলার পাশেই আমরা ঘুমুতাম—কত সুখরাত্রি—কত বিনিদ্র অবকাশ—কত মধুর আলাপনে আমরা সময় কাটিয়েছি তা কি তুমি জানো?' একটু থেমে—'তারপরে এখানেই একদিন এই নিঃসঙ্গ শয্যায় কোনো-এক রাত্রে আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।'

মেয়েটি স্তব্ধ হ'লো। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিহ্বল গলায় বললুম, 'কেন? কেউ কি ছিলো না তোমার?'

'ছিলো না? বলো কি তুমি? আমার কেউ ছিলো না! আমার তো তিনিই ছিলেন—পৃথিবীতে কোন সুখ আছে, কোন আনন্দ আছে যা আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি! তাহ'লে শোনো—'

মেয়েটি আবার হাঁটু ভেঙে মেঝের উপর বসলো—দুটি হাতের পাতা মেঝের উপর রেখে শরীরের ভর রাখলো তার উপর। হাত বেয়ে-বেয়ে ছড়িয়ে রইলো তার লম্বা চুল—আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে তার কথা শুনতে লাগলুম।

আমার স্বামী ছিলেন দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। তা কেবলমাত্র এইজন্যে নয় যে তিনি আমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসতেন। মানুষ হিশেবেই তিনি অতি উঁচুদরের ছিলেন।

আমি যখন তাঁকে বিয়ে করলুম সমস্ত আত্মীয়রা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। তাঁদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার কখনোই কোনো সংযোগ ছিলো না—তাই তাঁদের চোখ আর আমার চোখও ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসলে তিনি গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষ ব'লে নানারকম সুনাম দুর্নামের অকারণ ভাগী হ'তে হয়েছিলো তাঁকে। যে-কোনো তুচ্ছ কথাও পল্লবিত হ'য়ে রটনা হ'তো তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি খাঁটি শিল্পী—ও-সব পার্থিব নিন্দা-প্রশংসা তাঁকে স্পর্শ করতো না। সাধারণ মানুষের মতো তাঁর চরিত্র ছিলো না ব'লে অনেক কথা তিনি বুঝতেও পারতেন না।

সমস্ত যন্ত্রের উপরই ছিলো তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা। ঈশ্বর তাঁর আঙুলগুলোকে যেন সুর দিয়ে গ'ড়ে দিয়েছিলেন। যে-যন্ত্রের উপর যে-মুহূর্তে তিনি আঙুল ছোঁয়াতেন সেই মুহূর্তেই তা যেন প্রাণ পেয়ে কথা ব'লে উঠতো। আর সে-সুর গতানুগতিক সুর ছিলো না—সে-সুর কী? সেই অনির্বচনীয় অনুভূতিময় শব্দ-সমন্বয়কে আমি কী-নাম দেবো? হাওয়ায়-হাওয়ায় লীলায়িত হ'য়ে ফিরতো তাঁর সুর—সে-সুর শুনলে মানুষ আত্মবিস্মৃত না-হ'য়ে পারতো না। একদিন মনে আছে—কোনো-এক রাত্রে আমরা পাশাপাশি শুয়ে গল্প করছিলাম। তাঁর বাঁ হাতের উপর ছিলো আমার মাথা। ডান হাত দিয়ে তিনি আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি কৌতুক ক'রে বললুম, 'ও সঙ্গীতজলধি—তোমার আঙুলকে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না—হঠাৎ যদি এখন আমার চুল একটা চাঁদের আলোর গান গেয়ে ওঠে!'

'চাঁদের আলোর গান?' সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গলা যেন ভ্রমরের মতো গুঞ্জন ক'রে উঠলো। আমার লম্বা চুলের মধ্য থেকে হাত তুলে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, 'দাও বাজাই।'

'সে কী ?'

'বা রে, তুমিই তো বললে। দাও, একটা চুল ছিঁড়ে দাও।'

'সত্যি ?'

'সত্যি বলছি। তুমি তো ভালো কথাই বলেছো—চুলও তো একরকম সূক্ষ্ম তারই—বাজবে না কেন। নিশ্চয়ই বাজবে।' উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন তিনি। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাঁর মুখ। সে-মুখ কি মানুষের ? না দেবতার ? আমি দিলুম একটা চুল ছিঁড়ে। লম্বা চুলটার একটা দিক আস্তে দাঁতে কামড়ে ধরলেন, আরেকটা দিক টান ক'রে হাতে টিপে ধ'রে ঠিক তারযন্ত্রে যেমন ক'রে আঙুল চালায় সে-রকম ক'রে বাজাবার চেষ্টা করলেন। আমি তাকিয়ে আছি স্থির চোখে, আমার কান সজাগ। হঠাৎ একসময়ে অত্যন্ত অবিশ্বাস্যভাবে জয়জয়ন্তীর একটি খণ্ডস্বর যেন শুনতে পেলাম আমি—আবার তক্ষুনি মিশে গেলো—আবার শুনলুম, আবার মিশে গেলো—শেষে অতি সূক্ষ্ম শব্দে একটানাভাবে বেজে চললো। আমি যেন কোনো ভৌতিক ব্যাপার দেখছি। আমার স্বামীকেই আমার ভয় করতে লাগলো। এ কে ? এ কি মানুষ ? গভীর আবেগে আমার কান্না এলো। হঠাৎ আমি তাঁর দু' পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে বললাম, 'থামাও! থামাও! আমার ভয় করছে।' পট ক'রে চুলটা ছিঁড়ে গেলো। কিন্তু তিনি থামলেন না—মাথা থেকে আরেকটা চুল ছিঁড়ে নিয়ে আবার বাজাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে আর বাজলো না। ঐ এক মুহূর্তের জন্য কি ঈশ্বর এসেছিলেন তাঁর আঙুলে ?

ক্লান্ত হ'য়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি বললুম, 'ক্ষমতার সীমা আছে জানতুম—দেখলুম তা নেই।' তিনি আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু হাসলেন।

সঙ্গীতে আমার কান ছিলো অতিশয় তীক্ষ্ণ। এ-দখল আমার জন্মগত। স্বামীর সংস্পর্শে তা পরিণত হয়েছিলো শুধু। তাঁর নানারকম সব অদ্ভুত যন্ত্র ছিলো। মিস্ত্রি দিয়ে নানা আকারের সব খোল তৈরি করাতেন, তারপর তার বসাতেন নিজে। প্রচলিত কোনো যন্ত্রের মতো ছিলো না সে-সব, আর প্রচলিত কোনো রাগ-রাগিণীর চর্চাও করতেন না তিনি। তিনি ছিলেন স্রষ্টা। সমস্ত হৃদয়ভরা ছিলো তাঁর সুর—সুর তিনি তৈরি করতেন নিজে। যখন তিনি সুর তৈরি করতেন তখন অবিশ্রান্ত আমাকে কাছে ব'সে থাকতে হ'তো। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম কোনো ভুলও আমার কানকে ফাঁকি দিতে পারতো না। উনিও যে-ভুল কিছুতেই ধরতে পারতেন না, সে-সব পরমাণু ভুলও আমার কানকে নাড়া দিতো।

একদিন ওঁর বিশেষ একটি প্রিয় যন্ত্রে উনি সুর তৈরি করছিলেন—আমি চোখ বুজে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে শুনছিলুম। কিন্তু যতবারই উনি অন্তরায় এসে পৌঁছন, ততবারই কোথায় যেন কী ব্যাঘাত হয়, আর আমার চোখ আপনা থেকে খুলে যায়। যেন ভাত খেতে-খেতে হঠাৎ কাঁকর পড়েছে দাঁতে, তেমনি ক'রেই আমি শিহরিত হ'য়ে উঠি। আমার স্বামী বললেন, 'কিছুতেই ভুল হ'তে পারে না—তোমারই বাড়াবাড়ি—আমি ঠিক করছি!'

আমি বলি 'উঁহু।'

'আচ্ছা, আবার শোনো—' আবার তন্ময় হই—কিন্তু ঐ জায়গায় এসে ঠিক তেমনি শিহরিত হ'য়ে উঠি আবার। বার-বার দশ বারেও যখন ঐ ভুলের কোনো মীমাংসা হ'লো না তখন দেখলুম আমার স্বামীর চোখে যেন আগুন জ্ব'লে উঠছে—শিল্পীর সুবৃহৎ চোখে অপার যন্ত্রণা। আর-একবার যেই শিহরিত হলুম অমনি উনি সেই যন্ত্রের বাটটি দিয়ে আমার মাথায় একটা আঘাত করলেন। ঐ আঘাতে সমস্ত তারগুলো একসঙ্গে ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেই স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। আমি মাথায় হাত দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজলাম। মুহূর্তে সে-যন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি—তাঁর সকলের চেয়ে প্রিয় যন্ত্র এটি—সকলের চেয়ে অভিনব ছিলো এর সুরঝঙ্কার—সকলের চেয়ে বেশি চিন্তা করতে হয়েছিলো এটি উদ্ভাবন করতে। মেঝের উপর আছাড় খেয়ে ফেটে গেলো—উনি উন্মাদ হাতে তারগুলোও পটপট ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে—ব্যাকুল আগ্রহে তুলে ধরলেন আমার মুখ, তারপর আমার অশ্রুসিক্ত গালের উপর প্রবল আবেগে নিজের মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে আদর করতে-করতে বললেন, 'তোমার চেয়ে প্রিয় আমার কেউ না—কিছু না—ঐ যন্ত্রটাও না! যার জন্য তোমাকে আঘাত করবার মতো দুর্মতি আমার হয়েছিলো, ঐ ছাখো তার দশা।' ভেবেছিলাম কঠোর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকবো, কিন্তু এর পরে কি তা সম্ভব? মুখ মুছে বললুম, 'আমার পাগলা শিব—' তারপর সযত্নে তুলে আনলুম যন্ত্রটি—কাপড়ের আঁচলে মুছে সন্তানস্নেহে হাত বুলোতে লাগলুম ঐ ভাঙা কাঠ আর ছেঁড়া তারগুলোর উপর। ভর্ৎসনা ক'রে বললুম, 'ছি ছি ছি, এ তুমি করলে কী?'

অনেক গুণীমানীই পা রাখতেন আমার এই অপরিসর ঘরে। আমি সানন্দে সকলকে অভ্যর্থনা জানাতুম—চা ক'রে দিতুম নিজের হাতে—আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব সযত্ন ব্যবহার করতুম তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা সবাই আমাকে তাঁদের বন্ধুতা দিয়ে কৃতজ্ঞ করতেন। অনেককেই বলতে শুনেছি, 'গুণীর যোগ্য স্ত্রী

আমি।' কিন্তু আমিও যে একজন গুণী এ-কথা যিনি বললেন তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রেই আজ আমার এই পরিণতি।

সংসারের সকল ভারই ছিলো আমার উপর। এ-সব বিষয়ে আমার স্বামী ছিলেন নিতান্ত উদাসীন। আমি কী করলুম, ভালো করলুম কি মন্দ করলুম, এ নিয়েও তাঁর কোনো চিন্তা ছিলো না। তিনি সদাসহাস্য, সদাসুখী। আমি যে তাঁর গৃহে আছি এটাই ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। এ-বাড়ির প্রত্যেক আনাচে-কানাচেও যে আমারই অস্তিত্ব এই অনুভূতিই ছিলো তাঁর কাছে মহা উপভোগ্য। এ-জন্যে একদিনের জন্যও আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারতুম না। শুধু যে তিনিই দুঃখিত হতেন তা নয়—আমারই মন-কেমন করতো। বিয়ে হয়েছিলো আমাদের সাত বছর, কিন্তু আমাদের মনে হ'তো যেন সাত দিনও হয়নি। তখনও প্রতি রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে খানিকক্ষণের জন্য আমরা বিহ্বল হ'য়ে থাকতুম, মনে-মনে উপভোগ করতুম পরস্পরের সান্নিধ্যসুখ।

আমার স্বামী যে-সব সুর রচনা করতেন তা একটু অদ্ভুত। রাগ-রাগিণীকে দিয়ে তিনি সজীব মানুষের মতো কথা বলাতেন সুরে। সুরের মধ্য থেকেই আমরা কল্পনা করতে পারতুম তাদের রাগ-অনুরাগ, হাস্য-পরিহাস কিম্বা প্রণয়গুঞ্জন। যেন কখনো গম্ভীর কথাবার্তা হচ্ছে, কখনও চপলতা, কখনো গভীর প্রেমালাপ। এ-সব সুর যখন বাজতে থাকতো, আমার মনে তখন কথা তৈরি হ'তো। আস্তে-আস্তে সেই সুরগুলোকে আমি কথা দিয়ে মূর্তি দিতে লাগলাম। হয়তো কথাগুলো তেমন ভালো হ'তো না, কিন্তু তাইতেই সুরগুলো যেন আনন্দে আত্মহারা হয়েছে মনে হ'তো। উনি যখন বাজাতেন, সঙ্গে-সঙ্গে গুনগুন ক'রে আমি সে-কথাগুলো গাইতাম। না-গেয়ে পারতাম না।

সন্ধ্যাবেলা নানা লোকের সমাগমে আমাদের ঘর মুখরিত হ'য়ে উঠতো। সবচেয়ে কম আসতেন তিনিই—যাঁকে নিয়ে আমার এই গল্প। সেদিন তিনি এসেছেন, আমার স্বামী আমাকে ডাকলেন। বিব্রত ছিলাম রান্নাঘরের কাজে—বললাম, 'তুমি বোসো গিয়ে, আমার দেরি হবে।'

'না, না, এসো—ইনি একজন অসাধারণ লোক—এঁর কাছ থেকে তুমি ঐ কথাগুলো ঠিক ক'রে নিতে পারবে।'

'কেন, উনি কি কথার কারিগর নাকি?'

'সত্যি, ঠাট্টা নয়—উনি গান নিয়ে ঠিক এই ধরনের চর্চাই করছেন। ওঁর ধারণা খুব স্পষ্ট।'

আলাপ ছিলো না এমন নয়, কিন্তু সামান্য। আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

আমার স্বামী বললেন, 'ইনি আমার সুরে অনেক কথা বসিয়েছেন—আমার খুব ইচ্ছে আপনি সেগুলো একটু দেখেন।'

বিনীত গলায় বললেন, 'স্বয়ং আপনি যেখানে, সেখানে আমার যে কথা বলতেই ভয় করে।'

আমি বললুম, 'আপনার দক্ষতার পরিচয় অনেক পেয়েছি—কাছাকাছি পাবার সুযোগ যখন হয়েছে তখন ও-সব ব'লে আর সময় নষ্ট করবো না—বসুন।'

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণচোখে একবার আমার দিকে তাকালেন।

তাঁকে সুদর্শন বললে হাসাহাসি হবে, কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম। আমি মনে-মনে বললুম 'গুণীজনোচিত বটে।' আমার পাগল স্বামী ততক্ষণে যন্ত্রের কান টানাটানি করছেন। হেসে বললুম, 'ওঁকে আগে চা ক'রে দি।'

আমি দেখেছি গাইয়ে বাজিয়ে লোকেরা ভারি চা খায়। আমার স্বামীকে যদি অবিরত কেবল কাপের পর কাপ চা দিয়ে যাই, উনি সানন্দে তা গ্রহণ করবেন, কিন্তু তা তিনি পান না—বরঞ্চ এ. নিয়ে অনেক সময় অনেক বকুনি খান। কাজেই এই ভদ্রলোকটির উপরই ইনি প্রসন্ন হ'য়ে উঠলেন। হাসিমুখে বললেন, 'এই এতক্ষণ পরে একটা ঠিক কথা বলেছো তুমি। মাঝে-মাঝে তুমি এত ভালো হও কেমন ক'রে?'

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন।

দেখলুম, আমার স্বামীর চাইতেও চা-খোর মানুষ আছে। এঁরা দু'জনে মিলে বড়ো রুপোর পটটি শেষ ক'রে গানে বসলেন।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কথাগুলো দেখালেন না?'

আমি ভারি কুণ্ঠিত হলাম। ঘন-ঘন তাকাতে লাগলাম স্বামীর দিকে—তিনি বললেন, 'বা রে, এতে আর একটা সংকোচের কী আছে? সবাই আমরা সমধর্মী। তুমিও তো একজন কম নও—'

'আপনারও এ-সব নেশা আছে নাকি?'

'আছে নাকি মানে?'—আমার স্বামী যন্ত্রের কান টেপা ছেড়ে সোজা হ'য়ে বসলেন—'এঁর কান যা সূক্ষ্ম তা যদি আমার থাকতো আজ সমস্ত পৃথিবী আমি জয় ক'রে ফেলতুম। তাছাড়া ইনি একটি অসাধারণ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী।'

'সত্যি ?'—কথাটা ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন যাতে একটু যেন ঠাট্টার গন্ধ পেলুম। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ওঁর ধারণা বোধহয় বেশি উঁচুতে ওঠে না—তাছাড়া স্ত্রীর প্রশংসারত মানুষটিকে বোধহয় তাঁর কাছে একটু স্ত্রৈণ ব'লেই বোধ হ'লো।

আমি বললুম, 'হয়তো ভাবছেন এই অতিশয়োক্তি আমি ওঁর স্ত্রী ব'লেই উনি করছেন। তা কিন্তু নয়। অতিশয়োক্তি করা ওঁর স্বভাব। তাছাড়া শিল্পীরা তো একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণই হন—এতটুকু ভালো দেখলেও আনন্দে আকুল হ'য়ে ওঠেন।'

'তাহ'লে নিজের গুণ সম্বন্ধে আপনিও নিঃসংশয়—এক্ষুনি আপনার লেখাগুলো আমাকে দেখানো উচিত।'

বিরক্ত হলাম। মুখে তবু হাসি রাখলাম সযত্নে। খুব সহজ হ'য়ে বললাম, 'সৎ সঙ্গে তো আছি—কিন্তু লেখাগুলো আমি আপনাকে দেখাবো না।'

'নিশ্চয়ই দেখাবে।'—আমার স্বামী তক্ষুনি লেখাগুলো আনবার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

আমি হেসে বললুম, 'উনি কি পারেন, ভেবেছেন ? উনি কি জানেন এ-বাড়ির কোথায় কী আছে ?'

'কেন ?'

'ওঁর সংসার মহৎ—তাই আমি আর আমার ঐ ছোটো সংসারে ওঁকে টেনে আনি না।'

'তার মানে ?' ভদ্রলোক একটু মনোযোগ দিলেন আমার কথায়।

'মানে তো আপনার জানবার কথা, এ-সব মানুষকে দিয়ে কি আর কখনো চাল-ডালের হিশেব করানো যায় ? এমনিতেই তো এই দরিদ্র দেশে শালগ্রাম শিলা দিয়ে সর্বদাই শিল-নোড়ার কাজ করানো হয়।—সংসারের চাপে ওঁকে যে উপার্জনের জন্যে সময় নষ্ট করতে হয় এটাই আমার কাছে একটা মর্মান্তিক পরিহাস মনে হয়, তার উপরে যদি গয়লার হিশেব আর মাছের বাজার, ধোপার কাপড় আর ছেলের বার্লির খোঁজও ওঁর ঘাড়েই চাপানো যায়, তাহ'লে আর ওঁর জীবনে থাকে কী ? এ-বাড়ির কোন জিনিশ কী-ভাবে কোথায় আছে তা উনি কিছুই জানেন না। আর জানলেও ওঁর মনে থাকে না।'

'আশ্চর্য তো !' ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক হলেন।

আমার স্বামী পর্দার ফাঁকে মুখ বার ক'রে বললেন, 'কী যে কোথায় রাখো—কিচ্ছু যদি পাই দরকারের সময় !'

আমি হেসে উঠে গেলাম। দেখলুম, ঐ সময়টুকুর মধ্যেই ঘরে একটি দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার হয়েছে। গোছানো বিছানা উলট-পালট—পরিচ্ছন্ন টেবিল একটি আস্তাকুঁড়।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই তীব্রচোখে তাকালাম ওঁর দিকে।

ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝেকে বললেন, 'পাই না তা কী করবো।'

'তাই ব'লে এ-রকম করবে ঘর-দোর—' গম্ভীর মুখে নির্দিষ্ট জায়গায় হাত দিয়ে বার করলুম লাল চামড়ার খাতাটি, তারপর বললুম, 'জানা কথাই তো পাবে না, কেবল অগোছাল ক'রে আমার কাজ বাড়ানো!'

তাড়াতাড়ি মুখের কাছে এগিয়ে এলেন উনি—আমি বললাম, 'অসভ্যতা করতে হবে না।'

'তবে বলো রাগ করোনি।'

'তা বলবো কেন—রাগ না-করবার কী আছে বলতে পাবো? এটা কিন্তু আমি দেখাবো না।'

'কেন দেখাবে না?'

'আমার ইচ্ছে।'

'সবই তোমার ইচ্ছে—আর আমার ইচ্ছে নেই।' টেনে উনি খাতাটা নিয়ে নিলেন।

সংকোচ ছিলো সত্যি। প্রথম কথা, আজকেই প্রথম নয়- আরো দু'একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে যা সামান্য আলাপ হয়েছিলো তা থেকেই বুঝেছিলাম স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইনি মনের মধ্যে একটা অবহেলা পোষণ করেন—কেমন যেন সদয় ভাব। কিন্তু সংকোচ কেটে গেলো যখন উনি মুখ তুললেন। খাতাটা কোলের উপর রেখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে, তারপর বললেন, 'চমৎকার।' আমার স্বামী খুশি হ'য়ে বললেন, 'কিছুতেই কি দেখাবে, জোর ক'রে নিয়ে এলাম—আমি জানতাম এ আপনি তুচ্ছ করতে পারবেন না।'

'এ-কথাগুলো আপনি গেয়ে যেতে পারেন?'

ল'জ্জত হ'য়ে বললুম, 'আমি কি গান করতে পারি, না শিখেছি!'

'গান তো ঐশ্বরিক—এ কি শিক্ষাসাপেক্ষ? এই যে কথা দিয়ে আপনি এমন বিরহ-মিলনের অদ্ভুত তত্ত্ব তৈরি করেছেন—এ কি কেউ শেখালে কোনো-দিনই পারতেন? আমি তো সমস্ত জীবনের সাধনাতেও এমন একটি সহজ সুন্দর আবেষ্টন কিছুতেই তৈরি করতে পারতাম না।'

আমি এ-কথায় আরক্ত হলাম। আমার স্বামী বাজাতে শুরু করলেন। বাঁশি বাজলে যেমন সাপ না-নেচে পারে না—উনি বাজাতে শুরু করলেও আমার গলা দিয়ে আপনিই স্বর বেরিয়ে আসে। খাতা দেখে গানগুলো আমি গাইলাম। ক্রমে বাজনা নিবিড় হ'য়ে-হ'য়ে শেষে সূক্ষ্ম হ'লো—অবশেষে থামলো—আমিও থামলাম।

ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি—কারো মুখে কথা নেই। দেখলুম, ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুগ্ধতার আবেশে গভীর—আমার উপরই সে-দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর মুগ্ধতা অনুভব ক'রে রোমাঞ্চিত হলুম—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঘন-ঘন তাঁর মুখের উপরই আমার চোখ ঘোরাফেরা করতে লাগলো—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্থির।

একসময়ে নিশ্বাস ফেলে উঠে বললেন, 'আজ যাই।'

'সে কী, আর-একটু বসুন।' আমার স্বামী ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

'না—আজ আর অন্য-কিছু নয়।' ধীরে-ধীরে উনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে স্বামীকে বললুম—'তুমি ভালো বলো, তাতে হৃদয় আপ্লুত হয়—তুমি যে কত ভালোবাসো তারই প্রমাণ পাই বারে-বারে, কিন্তু মনের অবচেতনে বোধহয় যারা ভালোবাসে না, তারা কিছু বলুক, নিরপেক্ষ কোনো লোক সত্যি-সত্যি আমার মধ্যে কিছু আছে কিনা তা বিচার করুক, এটাই চেয়েছিলাম।'

আমার স্বামী বললেন, 'তুমি তো দেখাতে চাওনি। আমি জানতাম এমন দিন আসবেই যেদিন তোমাকে কেউ গুণীজনের স্ত্রী ব'লেই সম্মান করবে না—তোমার জন্যই তোমার সম্মান হবে।'

আমি বললুম, 'সম্মানের জন্য নয়, তোমার যোগ্য হবার জন্যই আমার বড়ো হ'তে ইচ্ছে করে।'

এ-কথার পরে আমার স্বামী চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর স্পর্শে অনুভব করলুম তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়েছেন।

বাড়িটি আমাদের দু'জনের পক্ষেও ছোটো—তারই মধ্যে একটি ঘরে একটি ঘর-জোড়া নিচু তক্তাপোশের উপর নানারকম খাঁজ কেটে নানারকম যন্ত্র রাখা হ'তো। সকালবেলা ঘুম ভেঙেই তিনি ও-ঘরে যেতেন—ওখানেই চা খেতেন—আর রেওয়াজ করতেন। তিনি যতক্ষণ রেওয়াজ করতেন ততক্ষণ আমি সংসারের কাজে ঘুরে বেড়াতুম। কতগুলো স্বভাব তাঁর একেবারেই ছেলেমানুষের মতো

ছিলো। খাওয়া-পরা সকল বিষয়েই তাঁর মনের মধ্যে কতগুলো কল্পনা থাকতো—অথচ মুখে তা তিনি বলতেন না—কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বা অভ্যেস আমার এতই মুখস্থ ছিলো যে আমি তাঁর সঙ্গে দু'একটা কথা ব'লেই তাঁর সকল ইচ্ছা বুঝতে পারতুম আর সেই অনুসারে ব্যবস্থা করতুম। কখনো কদাচিৎ সেই ব্যবস্থার ত্রুটি ঘটলে ভারি ছেলেমানুষি করতেন। তাছাড়া অসম্ভব অগোছালো ছিলেন ব'লেও তাঁকে নিয়ে আমার মুশকিল হ'তো। গানের ঘরেই সেই নিচু তক্তাপোশের পাশে-পাশে ছোটো-ছোটো শেলফে তাঁর গানের বই, খাতা, রেকর্ড, স্বরলিপি আলাদা-আলাদা ক'রে সাজানো থাকতো। প্রত্যেক শেলফে একটা ক'রে ঢাকা ঝোলানো থাকতো—তার মধ্যে সুতোর অক্ষরে লেখা থাকতো কোনটার মধ্যে কী আছে। অথচ প্রত্যহ উনি বইয়েরটাতে খাতা, খাতার মধ্যে রেকর্ড, রেকর্ডের বাক্সে স্বরলিপি ঢুকিয়ে একটা অস্থির কাণ্ড ক'রে রাখতেন। এ নিয়ে বকুনি খেতেন যথেষ্টই, কিন্তু শোধরাবার চেষ্টা ছিলো না—বেশি কিছু বললে এমন একটা ক্ষমা-প্রার্থীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাতেন যে ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে আর-কিছু বলতে ইচ্ছে করতো না।

সেদিন সকালবেলা উঠেই আবার সেই সুরটি তৈরি করতে বসলেন (যেটি অন্তরায় এসে ভুল হচ্ছিলো)। আমি বললুম, অসম্ভব। এই সকালে আমি কাজ-কর্ম ফেলে বসতে পারবো না।'

কিন্তু তা কি আর হয়। বসলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো—কিন্তু সেই একই ভুল! কেন ভুল—কিসে শোধরাবে—কিছুই বার করা গেলো না। ভারি হতাশ হলেন উনি—ভালো ক'বে খেতে পারলেন না—কোনো কাজে মন দিলেন না, সারাদিন অন্যমনস্ক হ'য়ে কেবলই হাতে তুড়ি দিয়ে-দিয়ে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন।

আমি বললুম, 'ব্যাকুল হোয়ো না—নিশ্চয়ই একদিন এ-সুর ধরা দেবে তোমার কাছে।' উনি বললেন 'উঁহু—এজন্য চাই ভাষা—ভাষার আবেদনে যদি সুর আসে—চলো, আমি আবার বাজাবো আর তুমি কথা তৈরি করবে।'

সমস্ত দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'য়ে গেলো—ক্লান্তিতে অবসন্ন হলুম—সুর এলো না। আমি উঠে এলুম, উনি যন্ত্র হাতে ব'সে রইলেন ধ্যানস্থ হ'য়ে।

সন্ধেবেলা আবার এলেন সেই ভদ্রলোক। দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালুম। আমার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদুহাস্যে বললেন, 'ভালো আছেন? পণ্ডিত কই?' আমার স্বামীকে তাঁর সমসাময়িকরা অনেকেই পণ্ডিত ব'লে সম্বোধন করতেন। পাখা খুলে দিয়ে বললুম, 'বসুন, ডাকছি।'

গানের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। ঘরটা যেন সুরে ভ'রে গেছে—দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তারের ঝঙ্কার, আর সেই একঘর সুরের মধ্যে ব'সে আছেন আমার স্বামী, হাতের আঙুল বেয়ে তাঁর নেমে আসছে সুরের বন্যা। দুই চোখ তাঁর বোজা, নিজের মধ্যেই নিজে তিনি মগ্ন। ডাকলুম, 'শোনো—' দাউ-দাউ আগুনের মধ্যে থেকে যেন উনি বেরিয়ে এলেন—ডাক কানে যেতেই চকিত হ'য়ে চোখ তুললেন, আমার দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত গলায় ব'লে উঠলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি—তুমি আশ্চর্য! তুমি মহৎ! তোমার কাছে আমি হার'মানলাম আজ।'

আমি লাফিয়ে উঠলুম, 'পেয়েছো? ঠিক সুর পেয়েছো?'

'তখন তুমি গাইছিলে—তোমার গলা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছিলো সে-সুর। চোখ বেঁধে দিলে অন্ধ যেমন কাছ ঘেঁষে যায় অথচ চোর ধরতে পারে না—ঠিক সে-রকম একটা আন্দাজ পাচ্ছিলাম তোমার গলায়—কিন্তু আমি ধরতে পারছিলাম না—এইবার পেয়েছি—এসো।'

বললুম, 'ঐ ভদ্রলোক এসেছেন।'

'কে? কবি?'—ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, আমি একেবারে স্নান ক'রে আসি!' আমি এ-ঘরে চ'লে এলুম। অন্ধকার হ'য়ে এসেছিলো—আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বললুম, 'আজ সমস্তটা দিন উনি পাগলের মতো খেটেছেন। স্নান ক'রে আসছেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনিও কি ব্যস্ত?'

'না, ব্যস্ত আর কি।'

'তাহ'লে বসুন না।'

বসলুম।

একটু পরে উনি বললেন, 'নতুন কিছু লিখলেন?'

লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'কী আর।'

'আশ্চর্য আপনার সৃজনীশক্তি! আপনি যখন গান করেন তখন আপনি সৃষ্টি করেন—আমি তো ভাবতেই পারি না মেয়েদের মধ্যে কী ক'রে আপনি সম্ভব হলেন!'

বললুম, 'আমাকে অত অসামান্য ক'রে দেখছেন, সে আপনারই মহত্ত্ব! কিন্তু এ-কথা না-ব'লে পারছিনে যে মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার আশাটা বেশি উঁচু নয়, সম্মানটা তত গভীর নয়।'

'আমার? কখনোই না। আপনি ভুল বলছেন। আমি অনেক দেখেছি,

অনেক ভেবেছি—কিন্তু পুরুষ এনে দেবে আর তাঁরা খাবেন আর সন্তানপালন করবেন, এ ছাড়া তো দ্বিতীয় অবস্থা আমি দেখিনি।'

একটু আহত হ'য়ে বললাম, 'আজকাল অন্তত এ-কথা খাটে না।'

'আজকাল ? আজকালকার অবস্থা আরো শোচনীয় !'

ভদ্রলোকের নিজের কথার উপরে এত দৃঢ় প্রত্যয় যে আমি আর কথা কাটলাম না।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন, 'রাগ করলেন ?'

'না তো।'

'তবে যে জবাব দিলেন না ?'

'কী বলবো বলুন।'

পরদা ঠেলে আমার স্বামী ঘরে ঢুকে বললেন, 'একেবারে স্নান ক'রে নিলাম।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু চা দাও ওঁকে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁর সঙ্গে আমার তর্ক হচ্ছিলো মেয়েদের নিয়ে—'

'ওরে বাবা, ওদিকেই যাবেন না—ইনি কিন্তু ভীষণ ফেমিনিস্ট। তার চেয়ে চলুন ও-ঘরে যাই।' ভদ্রলোককে নিয়ে আমার স্বামী গানের ঘরে এলেন—আমি চায়ের কথা ব'লে গা ধুতে গেলুম।

ফিরে এসে দেখলুম গানের টেকনিক নিয়ে কথা বলছেন ওঁরা। আরো অনেক আগন্তুকে ঘর একেবারে ভর্তি। বক্তা বলতে গেলে একমাত্র আমার স্বামীই। গান সম্বন্ধে তাঁর মনে কতগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিলো—অন্যেরা তা হয়তো বুঝতেন না, কিম্বা বুঝলেও একেবারে নতুন-কিছু করতে ভরসা পেতেন না। চায়ের ব্যবস্থা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সবাই কথা থামিয়ে আমাকে একবার অভিবাদন জানিয়ে আবার কথা আরম্ভ করলেন। আমি নিচু হ'য়ে চা ঢালতে-ঢালতে শুনছিলুম ওঁদের আলোচনা—সহসা সেই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কিছু বলুন—এর সহজ মীমাংসা বোধ হয় একমাত্র আপনিই ক'রে দিতে পারবেন।'

এ-কথায় আমি চকিত হ'য়ে চোখ তুললুম—অনেক জোড়া চোখও আমার উপরে নিবদ্ধ হ'লো। এত সব সূক্ষ্ম আর জটিল তর্কের মধ্যে যে আমাকেও কথা বলবার জন্যে কেউ আহ্বান করছেন এটা আমার পক্ষে সম্মানের সন্দেহ নেই—অন্যদের দিকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলুম অন্য-কোনো চোখেও এ-কথাটার সায় আছে কিনা। হতাশ হ'য়ে আমার দৃষ্টি ফিরে এলো—বললুম, 'ঠাট্টা করছেন ?'

'ঠাট্টা ! আমার কথা শুনে কি আপনার ঠাট্টা মনে হ'লো ?'

'আমি যাই মনে করি না কেন—অন্য সবাই এ-কথাকে তা ছাড়া আর-কিছুই মনে করেন নি।'

সকলের গলায়ই একটি মৃদু আপত্তির গুঞ্জন উঠলো, 'এ আপনার অন্যায় ধারণা। সত্যিই কিছু বলুন না এ-বিষয়ে।'

আলগা শোনালো তাঁদের প্রতিবাদটা। আমার স্বামী নিবিষ্ট হ'য়ে কী ভাবছিলেন, হঠাৎ বললেন, 'সত্যি তুমিই বলো না—আমাদের সঙ্গীত কি এখন একেবারেই নিষ্প্রাণ হ'য়ে যায়নি? কী আছে এর মধ্যে? একে আবার গড়তে হবে—প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুরের মধ্যে। আমি রাগ মানি না, রাগিণী মানি না—'

বাধা দিয়ে একজন বললেন, 'তাই ব'লে তো আপনি এক ফুঁয়ে এ-সব রাগ-রাগিণীকে উড়িয়েও দিতে পারেন না—আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে এ-সব সুর—'

আমি বললুম, 'আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে ব'লেই যে সেটাই চরম তা কেন বলছেন? আর এ-কথা কি কেউ জানে যে সত্যি-সত্যি কোন রাগিণীর কখন কী রূপ ছিল? একশো বছর আগে এই ভৈরবীই যে রাত্রে গাওয়া হ'তো না আর ইমনই যে ভোরে গাইবার প্রচলন ছিলো না তা কে জানে?'

'তাই ব'লে কোনো-একটা নিয়মকে ভেঙে দেবো, এ-রকম একটা পণ ক'রে গান করতে বসাও কম বিড়ম্বনা নয়।'

'উঁহু, তা নয়—' ভদ্রলোক ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'উচ্ছৃঙ্খলতাটাই যে প্রগতি তা তো উনি বলছেন না। এখন সংগীত এসে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেখানে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় যদি এর রীতি না বদলায় তাহ'লে আনন্দের উপলব্ধিটা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হবে।'

আমার স্বামী খুশি হলেন এ-কথায়। অত্যন্ত মধুর ক'রে একটু হাসলেন, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা যন্ত্র টেনে নিলেন। স্নেহভরে খোলটার উপর হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'এটা কী? সেতার না এস্রাজ? বেহালা না বীণা? তানপুরা না তবলা? কী এটা? চেনো না তোমরা? কিন্তু তাই ব'লে কি এটার মূল্য তোমরা কম বলতে চাও? আর আমার রচিত যে-সুরটি আমি এখন বাজাবো', (তাঁর আঙুল কথার সঙ্গে-সঙ্গে তারের উপর লীলায়িত হ'লো), 'বলো দেখি তা পূর্বী না পূরিয়া, জয়জয়ন্তী না তিলক কামোদ, কানাড়া না বারোয়াঁ। —বিশ্লেষণ করলে কি ঠকলে—' আমাকে গাইবার জন্য ইশারা করলেন—তারগুলো সব ঝম্‌ঝম্ ক'রে উঠলো তাঁর স্পর্শে।

আমি বললুম, 'আমি কি জানি এটা?'

ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই জানেন—আপনি জানেন না এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।'

আমার স্বামী বললেন, 'এত সংকোচ থাকলে হয় কখনো? আশ্চর্য ওঁর কান।—আচ্ছা দেখুন তো, যে-সুরটা আমি বাজাচ্ছি এর কোনো জায়গায় আপনাদের খটকা লাগে কিনা।' ঢেউয়ের মতো তারের উপর দিয়ে আমার স্বামীর আঙুল গড়িয়ে যেতে লাগলো—দু'একজন নিতান্ত সজাগ প্রহরী ছাড়া আপনা থেকেই সকলের চোখ বুজে এলো।

একজন তার্কিক উশখুশ করছিলেন—বাজনাটা থামতেই ব'লে উঠলেন, 'ভুল কোথায়, তা ঠিক বুঝছিনে, তবে ভুল যে হচ্ছে এটা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

ভদ্রলোকটি বললেন, 'তা বললে তো চলবে না, ভুলটা কোথায় তাই আপনাকে ধরতে হবে।'

'আপনি পেরেছেন?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কী। আমি তো তর্কও করিনি।'

আর সবাই চুপ ক'রে ছিলেন—এর মধ্যে কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক চুল ভুল রয়েছে কারো কানেই সেটা ধরা পড়েনি।

আমার স্বামী বললেন, 'এ-ভুল আমিও ধরতে পারিনি—পেরেছেন উনি—আর ভুলের সংশোধনও আমি ওঁর গলা থেকেই পেয়েছি—এই শুনুন—' তিনি আবার অন্তরাটা ধরলেন—'আমি সুর তৈরি করি, কিন্তু তাই ব'লে তা তো অনিয়মে চালাইনি—একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে এর মধ্যে—একটা সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ আছে এ-সব সুরের পর্দা—সেই পর্দাচ্যুত হচ্ছিলাম—অথচ বুঝতে পারছিলাম না—এই দেখুন নিখাদ আর রেখাব থেকে কেমন ক'রে সুরটা আমাকে টেনে রাখতে হবে। এখানে আঙুল হেলাবো না—কিন্তু মনে হবে হেলাচ্ছি—দুটো শ্রুতি বার করতে হয়েছে এখান থেকে। এই দেখুন।'

প্রত্যেকেই কান পেতে গ্রহণ করলেন তফাৎটা—একটু অবাক হলেন সত্যি-সত্যি আমার এই সূক্ষ্ম শ্রুতিবোধ দেখে। চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে-দিতে একজন বললেন, 'আশ্চর্য তো আপনার কান।' ভদ্রলোক চুপ ক'রে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে—চোখে চোখ পড়তেই মাথা নিচু ক'রে গানের কথাগুলো দেখতে

লাগলেন। এক সময়ে মুখ তুলে বললেন, 'আপনারা কি শুধু ওঁর শ্রুতিবোধটাই দেখলেন—ওঁর অদ্ভুত রচনাশক্তিতে আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি। এ-ধরনের রচনা সত্যিই বিরল।'

আমি অস্বস্তি বোধ ক'রে উঠে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক বললেন, 'কী বলবো পণ্ডিত, আপনার স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষা না-ক'রে পারছি না।'

পণ্ডিত মৃদু হাসলেন—আমি ঘরে চ'লে এলুম।

এর পরে সেই ভদ্রলোক যেদিন এলেন আমার স্বামী বাড়ি ছিলেন না। আমি দ্বিধাজড়িত গলায় বললুম, 'উনি এখুনি আসবেন—বসুন না একটু।'

'তা উনি নাই বা এলেন—' নিতান্ত সহজ গলায় হাসিমুখে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি তো আছেন। আপনার সঙ্গও আমার কাছে পণ্ডিতের চাইতে কম লোভনীয় নয়।'

বিনয় ক'রে বললুম, 'কত ভাগ্যে আপনাদের মতো গুণীমানীর সাহচর্য লাভে ধন্য হচ্ছি, কত পুণ্য করেছিলাম তাই আমার বাড়ি আপনারা ধন্য করেন—কিন্তু তাই ব'লে আমি তো এটুকু বুঝি যে আমার মধ্যে এমন-কিছুই নেই যা দিয়ে আপনাদের ধ'রে রাখতে পারি।'

'আপনার বিনয় অনুকরণীয়—' হাতের ছাতাটি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আরাম ক'রে বসতে-বসতে ভদ্রলোক বললেন—'আমি কিন্তু অনেক পরিশ্রম ক'রে এলাম। আমাকে এক্ষুনি একটু চা দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই—' চায়ের জল চাপিয়ে এসে আবার বসলুম।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার রচনা দেখে সত্যি আমি আশ্চর্য হয়েছি। সুরগুলোকে কথা দিয়ে মূর্তি দেয়া তো সহজ নয়—ক'দিন লাগে আপনার?'

আমি এ-কথার অবতারণায় একটু কুণ্ঠিত হলুম। বললুম, 'ও আর কী। হয়তো ভালো ক'রে কিছু করলে সময় লাগতো—আমি ওঁর সুর বাজানোর সঙ্গে-সঙ্গেই কথা তৈরি করি—বাজনাটা থামলে আর পারি না। সুরে-সুরে আমি কথোপকথন শুনতে পাই।'

'শুনতে পান! তাই তো—শুনতে না-পেলে কি কেউ এমন সহজে এমন আশ্চর্য কথা লিখতে পারে। মনেরও তো একটা কান আছে। আমি একটা বৃহৎ উপাখ্যান লিখছি—সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি যত রাগ-রাগিণী আছে তাদের নিয়েই আমার এই উপাখ্যান। যখন যে-রাগিণীই আমার নায়িকা হয় তখনই তার মধ্যে আমি যেন ঠিক আপনাকে দেখতে পাই। কেন এমন হয়, বলতে পারেন?

অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'কী যে বলেন।'

'দেখুন, আপনাকে দেখবার আগেই আমি উপাখ্যানের প্রথম অধ্যায় লিখতে শুরু করি—কিন্তু কিছুতেই আপন অন্তরের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করতে পারছিলুম না—আর এখন আমি লিখতে-লিখতে কোথায় চ'লে যাই—কী আনন্দে যে আমার অন্তর ভ'রে ওঠে—' একটু বিহ্বল হ'য়ে থেমে রইলেন ভদ্রলোক, তারপর কথার স্বর বদলে ফেলে বললেন, 'ভেবে দেখলুম মেয়েদের যে শক্তি ব'লে আখ্যা দিয়েছে কথাটা খাঁটি সত্যি—'

জুতোর শব্দ করতে-করতে পণ্ডিত এসে ঘরে ঢুকলেন। ঘোরাঘুরিতে বিস্রস্ত চুল—ঈষৎ লালচে ও ঘর্মাক্ত মুখ—আমি মুখের দিকে তাকালুম। পরিশ্রমেও কি মানুষকে এমন মনোহর করে? অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু দেরি করেছেন ফিরতে—ভিতরে-ভিতরে একটা উৎকণ্ঠা চলছিলো—যদিও খুব প্রত্যক্ষভাবে আমি তা টের পাচ্ছিলুম না—কিন্তু তাঁকে দেখে হৃদয়টা হঠাৎ যেন একটা নিশ্চিন্ততায় ভ'রে গেলো। আমার মুখ-চোখ আপনা থেকেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। ভদ্রলোককে দেখে আমার স্বামী বললেন, 'এই যে, কতক্ষণ?'

'মন্দ নয়—'

'আমার আজ একটু দেরি হ'য়ে গেলো।'

'তা আর কী হয়েছে, ইনি ছিলেন।'

'বসুন।'—আমার স্বামী ভিতরে এলেন, এসেই আবার মাথা বার ক'রে বললেন, 'চমৎকার একটা সুর ভেবেছি—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবো—আসছি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'পণ্ডিত একেবারে খাঁটি শিল্পী।' সম্পূর্ণ সায় দিয়ে বললুম, 'সত্যি—' ভিতরে আসবার তাগিদে উঠে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক বললেন, 'এতক্ষণে আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনার যেন প্রাণ এলো।'

লজ্জিত মুখে বললুম, 'কই, না তো।'

চায়ের ব্যবস্থা ক'রে খুঁটিনাটি নানারকম কাজ সেরে ও-ঘরে যেতে আমার দেরি হ'লো। গিয়ে দেখলুম ভদ্রলোক উঠি উঠি করছেন। আমি যেতেই আমার স্বামী বললেন, 'তুমি কী করছিলে? তুমি নিজের হাতে চা দাওনি ব'লে ইনি খেতে পারলেন না—তুমি ছিলে না ব'লে ওঁর আর বসতেও ভালো লাগছে না।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিতান্ত মিথ্যা বলেননি পণ্ডিত—এ-বাড়িতে আপনার অনুপস্থিতিটা আমার একেবারেই সহ্য হয় না। আজ উঠি—'

'এক্ষুনি ? এই তো এলেন।'

'আছি তো নানান্ বিপাকে—' এই ব'লে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

তিনি চ'লে যেতেই আমার স্বামী হাই তুলে বললেন, 'যাই স্নান ক'রে আসি। ট্র্যামে বাস্-এ কি আর আজকাল চড়া যায় ? নরক—একেবারে নরক। কী ক'রে যে ঝুলে-ঝুলে বাড়ি ফিরি।'—চ'লে গেলেন তিনি স্নান করতে।

তাঁর চ'লে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গভীর ভালোবাসায় আমার হৃদয় উচ্ছল হ'য়ে উঠলো—একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

একটু পরেই উনি স্নান সেরে বেরিয়ে এলেন। একটা গেরুয়া রংয়ের পাজামার উপরি একটা সিলকের চাঁপা ফুলের রংয়ের পাঞ্জাবি পরেছেন, মাথার চুল চুঁইয়ে জল পড়ছে টপটপ ক'রে—জলের স্পর্শে চোখ দুটি রক্তবর্ণ। আকাশে বাতাসে আজ কী দেখেছেন উনি, অত্যন্ত উন্মনা—মাথা না-আঁচড়েই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। বুঝলাম, ভিতরে-ভিতরে ওঁর সৃষ্টির কাজ চলেছে। নিঃশব্দে খাতা আর কলম সাজিয়ে দিলাম টেবিলে—তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে জল-ভরা চুল মুছে দিতে-দিতে বললাম, 'তুমি হ'লে কী ? চুলটাও মুছতে পারো না ভালো ক'রে ?' সচেতন হ'য়ে ফিরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বললেন, 'তোমার নাম কি সরস্বতী ? তুমি কি ভালোবাসো আমাকে, না আমার সৃষ্টিকে ? আমার কী মনে হয়, জানো ? তুমি সেই ধরনের মানুষ, যারা গুণীর মর্যাদা দেবার জন্যই উন্মুখ—তাঁদের সুখ-সুবিধার অভাব হয়েছে শুনলেই হৃদয় হাহাকারে ভ'রে যায়—কিন্তু স্বামী ব'লে কোনো আলাদা ভালোবাসা কি আছে তাদের অন্তরের মধ্যে ?'

হাতের কাছে চিরুনিটা দিয়ে বললুম, 'এবার মাথাটা আঁচড়াও তো।'

'আচ্ছা, সত্যি ক'রে একটা কথা বলবে ? আমাকে যখন তুমি সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে বিয়ে করেছিলে, তখন কি এই ব্যক্তিটাই ছিলো বড়ো, না কি তার যোগ্যতা ?'

এ-কথার উত্তরে আমি বললুম, 'যোগ্যতাই মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ। —হ'তে পারে মানুষের ভালোবাসা অন্ধ—একটা লালা-ঝরা হাবাকেও হয়তো কত মেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ভালোবাসছে—আবার অতি কদর্য হীনস্বভাব একটি মেয়েকেও হয়তো একজন পুরুষ তার সকল হৃদয় সমর্পণ ক'রে ব'সে আছে, কিন্তু তবুও একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যখন একটা সম্বন্ধ দাঁড়ায়, তখন তার যোগ্যতাটাই প্রথমে মুগ্ধ করে। তারপর তা ছাড়িয়ে ব্যক্তির উপর চ'লে যায়—'

'তাহ'লে কথাটা এই দাঁড়ালো যে প্রথমে গুণ দিয়েই মানুষ মানুষের হৃদয় জয় করে—তারপর সে নিজে—'

'তর্ক যদি করতে চাও, এ নিয়ে অনেক কথাই বলতে হয়, কিন্তু সন্ধেবেলায় ব'সে-ব'সে তা করবো না—অনেক কাজ আছে।' আমি চ'লে আসছিলাম, আমার স্বামী আঁচল টেনে ধরলেন। 'না, তুমি যেয়ো না—সব সময় আমার কাছে থাকো তুমি। তুমি এত ভালো—এত আশ্চর্য যে আমার কেবলি ভয় হয় এই বুঝি হারিয়ে ফেললাম। আমি কি তোমার যোগ্য?'

বুঝলাম, কোনো কারণে একটু বিচলিত হয়েছেন। মাথার চুলে আদর দিতে-দিতে বললাম, 'পাগলামি না-ক'রে স্বরলিপির কতগুলো নতুন চিহ্ন বার করো তো। আর এক্ষুনি যদি না টুকে নাও, তা'হ'লে ঐ নতুন সুরটাও হারিয়ে যাবে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।' আমার আঁচল ছেড়ে হাতের উপর হাত রেখে একটু চাপ দিলেন, তারপর নীল শেড্-দেয়া টেবল-ল্যাম্পের তলায় মাথা নিচু করলেন তিনি। খাতার পাতা নিমেষে অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্নে রহস্যময় হ'য়ে উঠলো। তাঁর মুখে এতক্ষণ যে একটা সুখ-দুঃখের ছায়াপাত চলছিলো, সেটা কেটে গিয়ে উজ্জ্বল আভাময় প্রতিভা ফুটে উঠলো। নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি কাজে গেলুম।

এর কয়েকদিন পরেই কোনো-এক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে একটি গানের আসর বসলো। বাইরে থেকে একজন বীণা-বাদক এসেছিলেন, তিনিই আসল অথিতি—তাঁরই বাজনা। একটা বাজনা শেষ হ'লো এইমাত্র। সবাই স্তব্ধ। এমন সময় দরজা ঠেলে ঐ ভদ্রলোক ঢুকলেন। অকৃত্রিমভাবে খুশি হ'য়ে উঠলাম আমি। মনে-মনে আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। কেবলি মনে হচ্ছিলো এলে বেশ হয়।

ঘরে ঢুকেই একবার চারদিকে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'এ যে গান-বাজনার ব্যাপার। আমাকে যে খবর দেননি?'

তাঁর ছেলেমানুষি-ভরা অভিমানের ভঙ্গিতে আমি ঈষৎ হেসে জবাব দিলাম, 'প্রত্যক্ষভাবে দিইনি, কিন্তু পরোক্ষে দিয়েছি।'

'কী-রকম?'

'মনে-মনে তো আপনাকেই প্রার্থনা করছিলুম এতক্ষণ। বসুন।'

আমার এ-কথায় ভারি খুশি হলেন তিনি। হাসিমুখে আমার স্বামীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'পণ্ডিত, আমি তো অযাচিত অতিথি, কিন্তু ইনি বলছেন, তা নয়—মনে-মনে আমাকেই ইনি প্রার্থনা করছিলেন।'

আমার স্বামী হেসে বললেন, 'খুব আনন্দের কথা। আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দি।'

পরিচয়ের পালা সমাপ্ত হ'তেই ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চা বুঝি শেষ?'

'শেষ হ'লেও আপনাকে এক কাপ দিতে পারবো।'

'সত্যি! তাই জন্যেই তো কখনো কোনো ক্লান্তি এলেই আমার এখানে আসতে ইচ্ছে করে। শুধু কি চা-ই? আপনি যে দিচ্ছেন—তাতে যে আপনার স্নেহও পরিবেশিত হচ্ছে, এ-কথা ভেবেই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়। আপনাকে কী ব'লে যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো!'

সত্যি-সত্যিই হৃদয়ের মধ্যে একটা স্নেহ অনুভব করলুম ভদ্রলোকের জন্যে। আমরা মেয়েরা যাদের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল আর কোমল আমাদের কাছে ঠিক এই ধরনের মানুষদের ভারি অসহায় বোধ হয়। তাদের আপন ব'লে ভাবতে আমরা দ্বিধা করি না।

হঠাৎ আমার স্বামী বললেন, 'কবি, আপনার এবার বিয়ে করা উচিত।'

'বিয়ে? বিয়ে করবো কেমন ক'রে? এমন তো কোনো মেয়ে দেখলুম না, যাকে দেখেই স্ত্রী ব'লে পেতে ইচ্ছে করে।'

একজন আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে হেসে বললেন, 'দেখলেন তো, আপনার উপস্থিতিতেই উনি মেয়েদের ও-রকম ক'রে কথা বলছেন।'

ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন, 'উনি? ওঁর সঙ্গে তো কারো তুলনা হ'তে পারে না—ওঁর মতো মেয়ে কি আর একাধিক জন্মায়? পণ্ডিত সত্যিই পণ্ডিত! উনি শুধু সঙ্গীতের আসল রসই আবিষ্কার করেননি, জীবনের সুখ-শান্তির আসল মূলটিও উনি খুঁজে বার করেছেন। ওঁর মতো স্ত্রী কি আর সকলের ভাগ্যে জোটে!'

এ-কথায় আমি লজ্জিত হলুম। একটু উস্‌খুস ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'যাই, আপনার চা নিয়ে আসি।'

রাত বারোটা পর্যন্ত চললো গান-বাজনা—অনেক তর্ক, অনেক কচকচি—কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না—বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক বললেন, 'এত ভালো লাগে আপনাদের এখানে এলে, মনে হয় রোজ আসি।'

স্বামী তখনো গুনগুন করছিলেন, আমি বললুম, 'বেশ তো, সে তো আমাদের সৌভাগ্য। আর ভালো লাগাটা তো পারস্পরিকই।'

'পারস্পরিক? আশ্চর্য! আমার তো ধারণা কেউ আমাকে পছন্দ

করে না। সংসারে আমি একটা উৎপাত। এই দেখুন বাড়িতে কেউ আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না—রাগ ক'রে তিন দিন খাইনি—খাইনি তো খাইনি! কার ব'য়ে গেছে আমাকে সেধে-সেধে খাওয়াতে। আসলে কী জানেন, মানুষটা আমি নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া—কী বলা উচিত, কী করলে কী হয়, কিচ্ছু ভেবে-টেবে চলি না—তাই কারো প্রিয়ও হ'তে পারি না।'

গুনগুনানি থামিয়ে আমার স্বামী বললেন, 'একটা গানের কাগজ বার করাবে ভাবছি—আপনার উপাখ্যানটি কদ্দূর?'

'হ'য়ে এলো—লেখাটা যে আমার কী ভালো হচ্ছে ভাবতে পারবেন না। কাব্যলক্ষ্মী আমাকে ধরা দিয়েছেন—তাঁকে যেন চোখে দেখতে পাই আমি।'

আমি বললুম, 'আপনারা যে-ধরনের সংগীত রচনা করছেন তা দেশের লোক গ্রহণ করবে কিনা তার একটা মহড়া হ'য়ে গেলে মন্দ হ'তো না। এতে তো একেবারে সংগীত আর সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়ানো হচ্ছে—সুরসৃষ্টিরও যতখানি মূল্য, সুরপ্রকাশের এই ভাষাসৃষ্টিটাও তো ততখানি মূল্যবান?'

'নিশ্চয়ই। আমি যা লিখেছি তা বাংলাভাষায় একটা আশ্চর্য প্রেমের কাহিনী হিশেবেও স্মরণীয় হবে।'

আমার স্বামী বললেন, 'উৎসুক রইলাম—প্রথম মহড়াটা এখানেই হবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই—পর্শু ই খানিকটা নিয়ে আসবো।'

'পর্শু?' আমার স্বামী চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলেন কী আছে—তারপর ব্যাকুল চোখে তাকালেন আমার দিকে।

আমি তাঁর ভঙ্গি দেখে হেসে বললুম, 'কিচ্ছু যদি মনে থাকে। পর্শু না তোমার একটা সভা আছে? সংগীত সম্বন্ধে উনি বলছেন সেদিন—'

'আপনি? আপনিও যাবেন?'

'না, আমার সেখানে নিমন্ত্রণ নেই।'

'তাহ'লে আর কী, পণ্ডিত নিশ্চয়ই দেরি করবেন না।' আমাদের কিছু বলবার অবকাশ না-দিয়ে তিনি দুমদাম ক'রে নেমে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুম এলো না আমার। ওঁর গায়ে হাত রেখে বললুম, 'ঘুমিয়েছো?'

'না।'

'চুপ ক'রে আছো যে?'

'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী-কথা ?'

'থাক, বলবো না।'

'বলো না', আমি আবদারের সুরে কথাটা ব'লেই ওঁর আরো কাছে এগিয়ে এলুম। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন তিনি—ভেজা-ভেজা গলায় বললেন, 'ধরো যদি এমন হ'তো যে তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হ'লো তখন তোমার বিয়ে হ'য়ে গেছে—কী হ'তো ?'

'ঈশ, কী একটা ভাবনার কথা !'

আমার ঠাট্টায় উনি মন না-দিয়ে বললেন, 'সত্যি—তুমি বুঝছো না—এটা একটা ভাবনারই কথা।'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তোমার যেন কী হয়েছে, কী যেন ভাবছো দু'দিন থেকে।'

নিশ্বাস নিলেন তিনি, তারপর একটু শব্দ ক'রে হেসে উঠে বললেন, 'মাথায় আমার একটু সত্যিই দোষ আছে। তুমি ঠিকই বলো।'

'যাক, এতদিনে বুঝেছো তবে ?'

'একটু-একটু !'

'তাহ'লে এবার নিরুদ্বেগে ঘুমোও।'

'ঘুম কেন আসছে না ?'

আমি কপালে মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললুম, 'এবার নিশ্চয়ই আসবে।'

আমার হাত নিজের মুখের উপর চেপে ধরলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলুম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করলুম—রাত চারটা বেজে গেলো, ঘুম এলো না।

একদিন বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে আবার এলেন সেই ভদ্রলোক। ঘরে ঢুকেই একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করলেন তিনি। দড়াম ক'রে ছাতাটা ফেলে দিয়ে আরাম ক'রে বসলেন কৌচের উপর। বললেন, 'উঃ, কী ঘোরাটাই ঘুরেছি, এক গ্লাশ জল দিন শিগগির।

তাকিয়ে দেখলুম চেহারার আর হাল রাখেননি। একমাথা রুক্ষ চুল, অতি মলিন জামা-কাপড়—মুখটা যেন পুড়ে গেছে। জল দিয়ে বললুম, 'এত কী ঘোরেন আপনি বলুন তো ? সময় নেই, অসময় নেই ? চেহারা আপনার ভয়ানক খারাপ হয়েছে।'

'এই দেখুন, এ-কথা আপনি বললেন—কে বলতো আর ? তবে আর কারো মুখে শুনলে অবিশ্যি আমার এত ভালোও লাগতো না।'

চোখ নামিয়ে বললুম, 'বসুন। চা ক'রে আনি।'

'পণ্ডিত কখন আসবেন ?'

'খুব বেশি দেরি হবে না হয়তো—'

'তা হ'লে তো চা-টা একসঙ্গে খাওয়াই ভালো।'

মৃদু হেসে যেতে-যেতে বললুম, 'তা আর কী হয়েছে। ওঁর সঙ্গে আবার খাবেন।'

ফিরে আসতেই বললেন, 'দেখুন, পৃথিবীতে আমি এখন যত মানুষের কথা ভাবি, আপনার কথাই ভাবি সব চাইতে বেশি। যখনই কোনো অপ্রিয় কাজ করতে হয়, তখনই মনে হয় আপনি হ'লে ঐ ছোটো সংসার থেকে আমাকে মুক্তি দিতেন, বৃহৎ সংসারের জন্য সময় পেতাম কিছু।'

এ-কথায় আমি অস্বস্তি বোধ ক'রে বললুম, 'কবি, আপনি আমাকে অকারণে বাড়িয়ে তুলছেন। আমার পরিমাণ আমি তো জানি।'

'জানেন না। কিছুই জানেন না আপনি। কতখানি বললে আপনাকে ঠিক বলা যায় তার কোনো পরিমাণ আপনি জানতেই পারেন না—'

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে বাধা দিলুম। 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখন চা খান।'

হাসিমুখে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'পণ্ডিত ভালোবাসেন ব'লে বোধহয় চা তৈরির সমস্ত তথ্যই আপনি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন ?'

'কেন ?'

'এত ভালো চা কি আর কেউ করতে পারে ?'

এ-কথায় আমি মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম—চোখে চোখ পড়লো—কথা ভুলে গেলুম, সহসা আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। সহজ হ'তে একটু সময় লাগলো আমার। উনিও নিঃশব্দে চা পান শেষ করলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার আমি যাই।'

'আপনার উপাখ্যান—'

'আরে, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলুম সে-কথা।'

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'আজ থাক বরং, আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না।'

'ভালো না লাগার আর অপরাধ কী ? সারাদিন অনিয়ম করলে কোনো মানুষেরই ভালো লাগে না।'

'নিয়ম ? নিয়ম কী ?' উনি আবার ব'সে প'ড়ে বললেন, 'নিয়ম আমি মানি না। নিয়ম করলেই আমার শরীর খারাপ হয়। তাই জন্যেই তো আমি এখানে নিয়মিত আসি না—আমি ঠিক জানি নিয়মমতো এলে একটা বিভ্রাট আমার ঘটবেই।'

আমি বললুম, 'বিভ্রাটটা নিতান্তই দৈব, বিভ্রাট যদি মানুষের জীবনে ঘটেই তার বিরুদ্ধে আর লড়াই চলে না।'

'চলে না ? আপনি ঠিক বলছেন, চলে না ?' হঠাৎ তিনি আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো—আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এই যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, এত ভালোবাসি তার বিরুদ্ধেও কি—'

কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমার গলা থেকে একটি শব্দ নিঃসৃত হ'লো —'কবি!'

'না, না, আমাকে থামিয়ে দেবেন না, আমাকে বলতে দিন—আমাকে দয়া করুন—আমি আপনার অসম্মান করবো না—শুধু আমাকে এ-কথাটি বলতে দিন—কেবল বলতে দিন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি—' নিচু হ'য়ে তিনি আমার পদস্পর্শ করলেন।

আমি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়ে আহত কণ্ঠে বললুম, 'এতো বড়ো গুণীর যোগ্যই কি এই ব্যবহার ?'

গলার স্বর তাঁর যন্ত্রের মতো কেঁপে উঠলো।

'রাধা, এই একটা মুহূর্ত আমাকে দাও—তোমার সুখে ভরা জীবন থেকে মাত্র একটা মুহূর্ত, মাত্র একটা মুহূর্ত তুমি আমাকে দাও—' আমি দু'হাত বাড়িয়ে বাধা দেবার একটা ভঙ্গি করলুম, তিনি থামলেন না—'এই একটা মুহূর্ত আমাকে দিলে তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি কতখানি লাঘব হবো তা তুমি জানো না, তুমি বুঝবে না, কিছুতেই বুঝবে না এ যে কত বড়ো কষ্ট—কতখানি দুঃখ।'

ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখ বেয়ে জলধারা নামলো।

আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পাথরের মতো ভারি হ'য়ে উঠলো আমার পা দুটি। মৃদু গলায় বললুম, 'আপনি যান।'

নতমুখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'জানি, এই দুর্বল মুহূতটির জন্য মনের সংযত অবস্থায় আর আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারবো না—জানি, তোমার কাছে আমার আর মুখ দেখানো কত অসম্ভব হবে—কিন্তু একটা প্রার্থনা তুমি আজ পূরণ করো—আমাকে নিয়ে তুমি উপহাস কোরো না—

আমার সমুদ্রের মতো গভীর প্রেমকে তুমি আর পাঁচটা সাধারণ জিনিশের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে উপেক্ষা কোরো না—'

'আপনি বাড়ি যান—' আমার কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণ হ'লো।

ভদ্রলোক যেন চাবুক খেয়ে মুখ তুললেন—একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর আস্তে-আস্তে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। সহসা চোখ ঝাপসা হ'য়ে এলো।

শোবার ঘরে এসে দেখলুম, ইজি-চেয়ারে চোখের উপর হাত রেখে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তাঁর ভঙ্গিটি অত্যন্ত ক্লান্ত। বড়ো-বড়ো কালো চুল বিস্রস্ত—পায়ের জুতো ছাড়েননি—গায়ের উড়নিটি পর্যন্ত তেমনি গায়ের উপর জড়ানো। কাছে এসে বললুম, 'কখন এলে?'

শব্দ নেই।

মুখের থেকে চাপা হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললুম, 'আমি তো ঢুকতে দেখলাম না।'

সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখবার চোখ ছিলো না।'

নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'ওঠো, জামা-জুতো ছেড়ে নাও।' তিনি উঠলেন না। আমি বললুম 'শোনো—'

'ঐ যে তোমার মালা—' অত্যন্ত শ্রান্ত স্বরে তিনি কথাটা উচ্চারণ করলেন।

তাকিয়ে দেখলুম, বিছানার উপর বেলফুলের কুঁড়ির একটি মস্ত মালা প'ড়ে আছে—হাত বাড়িয়েছিলুম, হঠাৎ লাফ দিয়ে আমার স্বামী উঠে দাঁড়ালেন, এক ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে মালাটি টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় করতে লাগলো। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগেনি—কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কান্না-ভাঙা গলায় বললুম, 'তুমি কি—'

'যাও! যাও তুমি।' কী-রকম বুক-ফাটা গলায় যে তিনি 'যাও' শব্দটা উচ্চারণ করলেন তা আমি ভাষা দিয়ে আমি কেমন ক'রে বোঝাবো? দু' হাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠে বললুম, 'তুমি কি আমার কথা শুনবে না?'

'না, না, চাই না, চাই না—' আমার হাতের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে সবলে মুক্ত ক'রে তিনি আবার ইজি চেয়ারের উপর নিজেকে ছেড়ে দিলেন। আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সময় যেন ভারি হ'য়ে চেপে বসলো আমাদের উপর। থমথমে হ'য়ে উঠলো আমাদের আনন্দিত কক্ষ, সঙ্গীতের পরিবর্তে চারপাশে যেন শোকের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আমি নিজেকে সামলে নিলুম। আস্তে গিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে বললুম, 'তুমি কি পাগল হ'লে ?'

উনি জবাব দিলেন না। আমি হাতের উপর হাত রেখে বললুম, 'ওঠো, লক্ষ্মীটি—'

এক ঝটকায় আমার হাত ঠেলে দিলেন। অভিমানে আমার গলা বন্ধ হ'য়ে এলো, রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি—তুমি হ'লে কী করতে ?'

'আমি ?' আমি কী করতাম ?' রেগে উনি উঠে বসলেন—অনেকক্ষণ বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে দেখলেন আমাকে, হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'জানি না কী করতাম।'

আমি বললুম, 'এ কি আমার দোষ ?'

'জানি না, জানি না', উত্তেজিতভাবে মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে তিনি বললেন, 'জানতাম, আমি আগেই জানতাম যে এটা হবেই। তুমিও জানতে, কিন্তু তুমি—' কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি—গলা বুজে গেলো।

আমি শান্ত গলায় বললুম, 'যে-হতভাগ্য ভালোবেসে ব্যর্থ হয় তাকে আঘাত দেবার মতো নিষ্ঠুরতা আমার নেই।'

'ও, তাহ'লে সার্থক করবার ইচ্ছেও আছে তোমার ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে ব্যথিত গলায় বললুম, 'এ কি আমার অপরাধ ?'

'জানি না।'

'তুমি বুঝতে পারছো না—'

'চুপ করো, চুপ করো—'

'কিন্তু—'

'চুপ! চুপ!' অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন তিনি।

আমি নিঃশব্দ হলুম। মনে-মনে বুঝলুম, কথা বলা ব্যর্থ। হঠাৎ উনি উঠে আমার হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিলেন, আর্তস্বরে বললেন, 'বলো, বলো, লোকটাকে তুমি ঘৃণা করো কিনা—'

'তিনি তো ঘৃণার পাত্র নন।'

'নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা জেদ চেপে গেলো, বললাম, 'কাউকে ভালোবাসাটা কি ঘৃণ্য? সেটা কি ছোটো কাজ?'

'সেটার প্রকাশটা ছোটো হ'তে পারে।'

'প্রকাশটা তো ভঙ্গির উপরই নির্ভর করে। তিনি আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেননি।'

'এও অসৎ নয়? হা ঈশ্বর।' কপালে কর হেনে তিনি ধপ ক'রে বিছানায় ব'সে পড়লেন। তাঁর উজ্জ্বল শ্যাম কপাল ঘেমে উঠলো—তাঁর দেবদুর্লভ আঙুল থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো—তাঁর প্রতিভাদীপ্ত সমস্ত মুখ নীল হ'য়ে গেলো।

আমি জানি তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন—সেই মুহূর্তে যদি আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি তাঁকে ঘৃণা করি—' তাহ'লে আমার স্বামী প্রাণ ফিরে পান—তাঁর দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির ধারা নামে, কিন্তু আমি তো মিথ্যে বলতে পারিনে। আমাকে যিনি ভালোবাসেন তাঁকে আমি ঘৃণা করবো—এত বড়ো দম্ভ তো আমার নেই। কিন্তু আমার স্বামীর বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করলো মিথ্যে ক'রেই বলি—অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলুম। যাঁকে ভালোবাসি তাঁকে ভোলাতে পারিনে—মিথ্যা ব'লে তাঁর কাছে ছোটো হ'তে পারিনে। তিনি যে আমার কতখানি, তাঁর আসন যে আমার হৃদয়ের কোন গভীর প্রদেশে পেতে রেখেছি তা কি তিনি এত দিনেও বুঝলেন না? দুঃখ হ'লো। এই কি আমাদের সাত বছরের সম্পর্ক? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম মাথার কাছে, কেবল বড়ো-বড়ো ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো দু'চোখ বেয়ে।

ধীরে-ধীরে সময় গড়িয়ে চললো। কত যে মর্মন্তুদ সে-সময়ের দীর্ঘতা তা কাকে বলবো? রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে দু'জনেই নির্ঘুম চোখে ছটফট করতে লাগলুম। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বামীর করস্পর্শে জেগে উঠলুম। চোখ বুজেই অনুভব করলুম, আমার স্বামী ঝুঁকে পড়েছেন আমার মুখের উপর, শুনতে পেলুম অত্যন্ত মৃদু গলায় গানের মতো গুনগুন করছেন, 'আমার রাধা, আমার সোনা, তুমি আমার, তুমি আমার—' আমি দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠলুম। তিনি আমার জেগে ওঠা টের পেয়ে চমকে উঠেছিলেন—সামলে নিয়ে বললেন, 'কাঁদো কেন? তুমি ঠিক বলেছো। তোমার মতো মেয়ের যোগ্য কথাই বলেছো তুমি। আমিও বুঝেছিলুম কবি তোমাকে ভালোবাসেন—কিন্তু বুঝতে পারিনি তোমার অবচেতন মন কবির সেই ভালোবাসাকে সাগ্রহেই গ্রহণ করেছে—'

উঠে ব'সে বললুম, 'পণ্ডিত, ভালোবাসার কি কেবল একটাই ক্ষেত্র? কবিকে যে আমি ভালোবাসি আর তোমাকে যে আমি ভালোবাসি, দুটোর কি একই রূপ?'

'না, এক হবে কেন? কিন্তু কালক্রমে আমরা দু'জনে তোমার মনের এক জায়গায় এসেই পাশাপাশি দাঁড়াবো।'

'ছি!'

'ছি কেন, রাধা, তা কি হ'তে পারে না? তোমার হৃদয়ের গভীরতা সাধারণের অতীত, সেখানে অনায়াসেই তুমি দু'জনকে জায়গা দিতে পারো। আজ ভাবছো অসম্ভব, কিন্তু তুমি নিজেও জানো না কবে কখন একদিন দু'জনকেই তুমি একই ভাবে ভালোবাসতে শুরু করবে।'

'না, না,'—আমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠে তাঁর মুখে হাত চাপা দিলুম, 'এই কি আমার এতদিনের পরিচয় তোমার কাছে? আমার এত ভালোবাসার মূল্য কি তুমি এ-ভাবেই শোধ দিলে?'

'শোধ দেবো? তোমার ভালোবাসার? রাধা—' আমার স্বামীর গলা বুজে এলো, ভাঙা গলায় বললেন, 'তোমার শোধ কি কোনোদিন কোনো পুরুষ দিতে পারে? তুমি আমায় ভ'রে রেখেছো—তোমার স্নেহ, দয়া, প্রেম, সাহচর্য—সর্বোপরি তোমার সহযোগিতা—সে কি শোধ দেবার জিনিশ? কিন্তু ভেবে দেখলাম, এত ভালোবাসা এক আধারে আবদ্ধ থাকতে পারে না।'

'চুপ করো, চুপ করো—' কান্নায় আমার গলা ভেঙে এলো—'শান্ত হও। তুমি কি পাগল হ'লে? আমার পাগলা শিব—' আমি স্নেহভরে তাঁকে কাছে টেনে নিলুম। আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে তিনি যেন খানিকটা শান্তি লাভ করলেন।

এর পরে দু'তিন দিন কেমন একটা অশান্তিতে সময় কাটতে লাগলো। দু'জনেই দু'জনের কাছে যেন অপরাধী হ'য়ে আছি। তারপর আস্তে-আস্তে সে-ভাব কাটিয়ে উঠলাম আমরা, আবার আমার স্বামী সহজ হলেন, আবার আমাদের সেই অপরিসর গানের ঘর আনন্দগুঞ্জনে ভ'রে উঠলো। সবাই আসেন, আসেন না কেবল কবি। আমার মনের মধ্যে কেমন একটা অভাববোধ হ'লো। আমার স্বামী সেই অভাববোধের কেমন ব্যাখ্যা করবেন, তা আমি জানতুম, তবু তাঁর কাছে লুকোতে পারলুম না সে-কথা।

আমার ইচ্ছে শুনে স্বামী সহজভাবেই বললেন, আচ্ছা, ওঁকে আসতে বলবো একদিন। শুনছি ওঁর উপাখ্যানটা নাকি খুব ভালো হয়েছে।'

পরের দিনই তিনি তাঁকে ধ'রে নিয়ে এলেন। একেবারে উপাখ্যান সমেত।

আমাকে বললেন, 'এসো এসো, বেশিক্ষণ ভদ্রলোককে আর বিরহ-পাথারে ফেলে রেখো না।'

আমি হেসে বললুম, 'ভারি যে ফাজিল হয়েছো।'

'হবো না? যা একখানা উপন্যাস করেছো তুমি!'

আমি হাতে চিমটি কাটলুম—উনি মুখ বাড়িয়ে নিতান্ত যুবকের মতো একটি কর্ম ক'রে পালিয়ে গেলেন।

আমি যখন ও-ঘরে গেলুম আমার স্বামী সেই উপাখ্যানের সংকেত দেখে-দেখে সুর বাজাচ্ছেন আর কবি সঙ্গে-সঙ্গে মৃদুগুঞ্জনে গেয়ে যাচ্ছেন সেই সুর। অলক্ষ্য হাওয়ার মতো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে সেই সুরের স্পর্শ। আমি নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—এক সময় চোখ তুলে আমার স্বামী আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কবি নতদৃষ্টিতে ছিলেন—আমার অস্তিত্ব অনুভব ক'রে তিনি আরো নত হলেন।

একটি বিশেষ রাগিণীকে ঘিরেই দেখলুম এই কাব্যের সৃষ্টি। প্রথম সর্গে আছে রাগিণীর বন্দনা, তারপর অনুরাগ, তারপর হতাশা, তারপরে অনন্তকাল প্রতীক্ষার সংকল্প।

গানের মৃদু গুঞ্জন ক্রমেই দরাজ হ'তে লাগলো। আমার স্বামী অচেতনের মতো বাজিয়ে চললেন, সুরের ঢেউয়ে তাঁর আঙুলের লীলা অপরূপ হ'লো—কবি দুই চোখ বুজে বিশ্বসংসার হারিয়ে ফেললেন, আকাশে-বাতাসে তাঁর সুরের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে গেলো। কেবল আমি সচেতন হ'য়ে ব'সে-ব'সে তাঁর অনুরাগে হতাশায় আর ব্যর্থতায় কেবল আমারই ছবি দেখতে লাগলাম। আস্তে-আস্তে গানের রেশ একেবারে উঁচু পর্দায় উঠলো—সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হ'লো যন্ত্র আর কণ্ঠ যেন একসঙ্গেই কেঁদে উঠলো—আর তাদের সেই মর্মভেদী কান্নায় সমস্ত পৃথিবী যেন একটা দীর্ঘ হাহাকারে ভ'রে উঠলো। হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'থামাও, থামাও।' মুহূর্তে দুটি মানুষ নিস্তব্ধ হ'য়ে থেমে গেলো।

জানি না গানের আত্মা আছে কিনা—কিন্তু সমস্ত শরীর আমার কেমন ছমছম করতে লাগলো সেই স্তব্ধ ঘরে—মনে হ'লো অসম্পূর্ণ সুরের অতৃপ্ত আত্মারা যেন অশরীরী হ'য়ে ঘরময় ঘুরে-ঘুরে আমাকে শাপ দিচ্ছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে আমার প্রতি রোমকূপে বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করলুম—আতঙ্কে দিশাহারা হ'য়ে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হলুম আমি, আমার পতনোন্মুখ দেহটিকে ধ'রে ফেললেন কবি, কম্পিত গলায় বললেন, 'পণ্ডিত, এ কী হ'লো?'

আমার স্বামী তখনো অভিভূত ছিলেন, চমকে উঠে আমাকে এসে জড়িয়ে ধ'রে কবির কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তাই তো, কী হ'লো?'

আমি ফিশফিশিয়ে ব'লে উঠলুম, 'আমার ভয় করছে, আমাকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এখান থেকে।'

ওঁরা আমাকে ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন—মাথায় জল ঢাললেন—এক সময় হঠাৎ আমার চেতনা ফিরে এলো। সচেতন হ'য়ে আমি উঠে বসলুম—লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'হঠাৎ যে কী হ'লো।'

আমার স্বামী আমার কাছেই ব'সে ছিলেন, নিঃশব্দে আমাকে স্পর্শ করলেন, আর সেই স্পর্শে সহসা আমার শরীরে যেন একটি সুগভীর শান্তি ব্যাপ্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো। মৃদুকণ্ঠে কবি বললেন, 'আমি এবার যাই।'

'কাল সকালেই একবার আসবেন', একান্ত অনুরোধের ভঙ্গিতে আমার স্বামী কবির হাত চেপে ধরলেন। সম্মতি জানিয়ে মুখ ফিরিয়ে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

শরীর দুর্বল ছিলো, তাড়াতাড়িই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম সে-রাত্রে—কাজেই পরের দিন অতি প্রত্যুষেই আমার ঘুম ভাঙলো, তখনো আলো ফোটেনি ভালো ক'রে। আবছা-আবছা অন্ধকারে আমি আমার পাশে শায়িত স্বামীর দিকে বাহু বাড়ালুম—অনুভব করলুম সে-স্থানটি শূন্য। বুকটা ধড়াশ ক'রে উঠলো। উঠে ব'সে ভালো ক'রে চারদিক তাকিয়ে দেখলুম। তারপর আস্তে-আস্তে নামলুম বিছানা থেকে। প্রথমেই উঁকি দিলুম গানের ঘরে, সেখানে নেই। বাথরুমের দরজাটি হাঁ ক'রে খোলা। তবে? তবে তিনি কোথায় গেলেন? গলা বুক যেন বন্ধ হ'য়ে এলো আমার। তুমি কই? তুমি কই? সমস্ত ঘরময় ঘুরে-ঘুরে তাঁকে ডাকতে লাগলুম—কোথাও তিনি নেই। চারদিক ভোরের আলোয় ভ'রে উঠলো। সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। আস্তে-আস্তে সে-আভা শাদা হলো, তীব্র হ'লো—আর আমি সেই আলোয় হঠাৎ আমার বালিশের পাশে একটি ভাঁজ-করা কাগজ লক্ষ্য ক'রে হাতে তুলে নিলুম।

এ হাতের লেখা আমার ভুল করবার কথা নয়। আমাদের বিবাহিত জীবনে কখনো আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি, তাই আমাকে আমার স্বামীর এই প্রথম পত্র—এবং এই শেষ।

'রাধা,

তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। আমার ভালোবাসার এর চেয়ে চরম প্রমাণ আর কী থাকতে পারে? প্রার্থনা করি, তুমি বড়ো হও।

হতভাগ্য পণ্ডিত।'

চিঠিখানা পড়া শেষ হ'য়ে গেলো, আস্তে-আস্তে অক্ষরগুলো মুছে এলো আমার চোখ থেকে। আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু কি ভেবেছিলাম, না কি মনটা শূন্যে পরিভ্রমণ করছিলো? জানি না। আমাদের ছোটো বাড়ির তিনটি মাত্র ঘরে আমি সহস্রবার প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলাম। আমার চেতনা ছিলো না, কী চাই, কী খুঁজে বেড়াই, তাও আমি ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পরিশ্রমে আমার কপালে ঘাম দেখা দিলো—বুকের ওঠা-পড়া দ্রুত হ'য়ে উঠলো, কাঁধ থেকে আঁচল স্খলিত হ'লো—তবু আমি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলাম। এক সময়ে বসবার ঘরে এসে আমার পা থামলো। হঠাৎ যেন লুপ্ত চৈতন্য ফিরে এলো আমার। তাকিয়ে দেখলাম, নতমুখে কবি দাঁড়িয়ে আছেন চুপ ক'রে; আমাকে দেখে সভয়ে দু'পা স'রে গেলেন, আর আমি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালাম। এবার আস্তে-আস্তে আমার বুক ঠেলে যেন একটা কান্নার ঢেউ গলা পর্যন্ত উঠে এলো—কিন্তু বন্যা নামলো না চোখে। একটা অসহ্য দুঃখের গুরু ভারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আমি মুখ তুললুম—কম্পিত হাতে চিঠিটি এগিয়ে দিলুম কবির হাতে। নিমেষে চিঠি পড়া শেষ করলেন তিনি। ব্যথায় বিস্ময়ে মুহূর্তে তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেলো। অনেকক্ষণ আমার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটা ভারি নিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'এত বড়ো দুঃখ দিলাম!' তাঁর মাথা নিচু হ'লো। উদ্গত অশ্রুকে কোনোরকমে বাধা মানিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় আবার বললেন, 'এ-দুঃখ আমারই রচনা। কিন্তু তোমাকে তো আমি কোনো দুঃখই দিতে পারি না। আমি যাবো, আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো তাকে—শুধু তুমি, তুমি এখানে অপেক্ষা কোরো।'

আমি নিঃস্পন্দ হ'য়ে রইলাম। এক সময়ে অনুভব করলাম, কবি চ'লে গেছেন। তারপর থেকে এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি। একদিন এক পলকের জন্যও এ-বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি। সমাজ সংসার থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ নির্বাসিত করেছিলাম। আমার কেউ ছিলো না, সমস্ত সঙ্গীরা আমাকে আস্তে-আস্তে ভুলে গিয়েছিলো। তারপর আমার ক্ষুধিত তৃষিত আত্মা একদিন পরিত্যাগ করলো আমার এই অবহেলিত জীর্ণ দেহ। অতি মলিন একটি শয্যার উপর ঠিক ঐখানটিতে আমার আত্মাহীন অসার দেহটি অনেকদিন প'ড়ে রইলো—কেউ দেখলো না, কেউ জানলো না—মৃত্যুর যন্ত্রণায় যখন উদ্বেল হ'য়ে ছটফট করলুম—কেউ এক ফোঁটা জল দিলো না মুখে। কিন্তু তবু আমি আছি, আমার এই বঞ্চিত, ব্যথিত আত্মা নিয়ে তবু আমি প'ড়ে

আছি এই গৃহে। ওগো পৃথিবীর সুখী মানুষ, আমার এই প্রতীক্ষা—আমার মিলনের আকাঙ্ক্ষা কেড়ে নিয়ো না, কেড়ে নিয়ো না এই নিরালা নির্জন অবকাশটুকু। আমাকে থাকতে দাও, থাকতে দাও,—দয়া করো, দয়া করো আমাকে—'

বলতে-বলতে মেয়েটি সবেগে উঠে এলো কাছে, এক মাথা চুল নিয়ে নিচু হ'য়ে ব্যাকুল হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার পা—তার সেই হিম-শীতল স্পর্শে আমি চমকে উঠে বসলুম। তাকিয়ে দেখলুম, পায়ের কাছে টিপয়ের উপর রাখা জলের গ্লাশটি উলটে প'ড়ে আমার পা জলে ভিজে গেছে। এ কি তার চোখের জল? জানলায় তাকিয়ে দেখলুম, আকাশ রঙিন হ'য়ে আসছে সূর্যোদয়ের আভাসে। তবে? তবে এতক্ষণ ধ'রে আমি এ কী শুনলুম? এ কী দেখলুম? আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম তবে? আমি মাটিতে পা ছোঁয়ালাম, আবছা-আবছা ভোরের আলোয় কোথাও তাকে দেখতে পেলুম না। কোথায় গেলো? কোথায় সে? হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের কষ্ট অনুভব করলুম। মনে হ'লো, আমার কতকালের প্রিয়তম সঙ্গীটি কোথায় হারিয়ে গেলো। আমি অস্থির হ'য়ে ঘরে-ঘরে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

ভোর হ'য়ে গেলো, লিচু গাছের মাথায় সূর্য চিকচিক করতে লাগলো। পৃথিবী ভ'রে গেলো শাদা আলোয়। চুপ ক'রে সেই ঘরে সেইখানটিতে বসলাম, খানিক আগেও যে সে এখানেই ছিলো বারে-বারে সে-কথা মনে ক'রে অস্থির হ'য়ে উঠলাম, তারপর এক সময় আমার সেই অতি আকাঙ্ক্ষিত সংসারকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। প্রথমেই পোস্টাপিশে এসে মা-কে আসতে বারণ ক'রে তার করলুম, তারপর খুঁজে-খুঁজে একটি মেস্-এ এসে আস্তানা ঠিক করলুম। মনের মধ্যে কেবল একটি প্রার্থনাই ভ'রে রইলো—সে সুখী হোক—তার এই নির্জন প্রতীক্ষা সফল হোক—তার ব্যথিত বিরহী আত্মা যেন একদিন শান্তি পায়, আর সেই শান্তিতে আমি যেন কখনো ব্যাঘাত না হই।

খণ্ড কাব্য

আমার চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি কি করুণাকে কোনোদিন অবহেলা করেছি? ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে কোনদিনও কি নিশ্চেতন ছিলাম? কিন্তু তবু—তবু কেন সংসার আমাকে শান্তি দিলো না, কেন সমস্তটা জীবন একটা দুর্নিবার তৃষ্ণা নিয়ে জীবনের মধ্যাহ্নে এসে এত বড়ো একটা দুঃখের সৃষ্টি করলাম—এত বড়ো একটা অন্যায়—এত বড়ো একটা অপরাধের বোঝা মাথায় তুলে নিলাম। আমি কি চেষ্টা করিনি নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে, করুণার প্রতি যাতে কোনো-রকম অকর্তব্য না হয়, তার জন্য কি নিজের সমস্ত সুখদুঃখের বিরুদ্ধেও আমি লড়াই করিনি? তাছাড়া করুণাকে কি আমি ভালোবাসি না? এই চোদ্দ বছরের সাহচর্য কি আমার মনে একটা গভীর মমতার আসনও পেতে রাখে নি? কিন্তু তবু—

আজ আবার এতদিন পরে আমি তাঁকে দেখলাম। দেখলাম তিনি তাঁর সেই চিরপরিচিত মধুর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন, চৌরঙ্গির কোনো-এক স্টপে, উস্কোখুস্কো চুল—অযত্নে পরিপাটি একখানা রঙিন শাড়ির আবরণ, রোগা ছিপ্‌ছিপে লীলায়িত শরীর, আর সেই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী তীক্ষ্ণ আর স্নেহ-মেশা উজ্জ্বল দুটি চোখ। ভাবিনি কথা বলবো কিন্তু আমার অচেতন আমাকে টেনেছিলো—আমি মূর্ছিতের মতো তাঁর কাছে গিয়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালাম। মাথার কাপড়টা খ'সে গিয়েছিল, অভ্যস্ত হাতে সেটা তিনি মাথার উপর টেনে দিলেন—মনে হ'লো মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে একটা নরম লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো—ঈষৎ সলজ্জ মুখে মৃদু গলায় বললেন, 'কেমন আছেন?'

ঠিক দু'বছর পরে এই আমাদের আবার দেখা। আমার গলায় কথা আসছিলো না—অফিসফের্তা অবিন্যস্ত চেহারা সম্বন্ধে একটু সচেতন হ'য়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে দাঁড়ালাম। জবাব না-দিয়ে একটু সময়ের জন্য তাঁর মুখের উপর আমার চোখ রাখলাম। চলিত অর্থে করুণা কি ওঁর চেয়ে অনেক সুন্দর নয়? চিরকাল শুনেছি সৌন্দর্যই পুরুষের মনকে বিচলিত করে—সৌন্দর্যের তৃষ্ণাই পুরুষের চিরন্তন নেশা—কথাটার অসারতা সম্বন্ধে মনে-মনে নিঃসংশয় হলাম। অবাধ্য চোখ সে-মুখ থেকে সরতে চাইছিলো না—শাসন দিয়ে তাকে নতদৃষ্টি করলাম। রুমালে মুখ

মুছে অতিরিক্ত সহজ হ'য়ে বললাম, 'কী ভাগ্য, কতকাল পরে আপনার দেখা পেলাম। সেন কোথায় ? কেমন আছেন ?'

'না, ওঁর শরীরটা ভালো নেই। আল্সারে কষ্ট পাচ্ছেন।'

'ও !'

'একটা ইনজেকসন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'আমি কি কোনো কাজে লাগতে পারি ?'

'না, না—আর আপনাকে আমি কত কষ্ট দেবো ?'

কথাটা তিনি কী-ভাবে বললেন জানি না, আমি মনে-মনে কষ্টের অন্য অর্থ করলাম। নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'কেউ কাউকে কষ্ট দেয়, না—আমরা নিজেরাই নিজেদের দুঃখ রচনা করি।'

'উপলক্ষ নিশ্চয়ই একটা থাকে ?'

'তা থাকে।'

'তা হ'লে আমি তো সেই অপরাধে অপরাধী।'

'আমার জীবনের সেটাই তো সবচেয়ে মহৎ অংশ, অনুরাধা দেবী।'

চকিতে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন—বাস্ এলো। দ্রুত পায়ে তিনি উঠে যেতে-যেতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসুন'।

ভিড়ে ভারাক্রান্ত বাস্—তাছাড়া আমার ট্র্যামের পাশ—কিন্তু তিনি আমাকে ডেকেছেন—সেখানে কি দ্বিধার প্রশ্ন ওঠে। লেডিস্ সীটটি খালি ক'রে দু'জন হতভাগ্য পুরুষ বিরস বদনে উঠে দাঁড়ালেন—আমি গিয়ে তাঁর পাশে বসলাম। তারপর সমস্তটা পথ আমি যে তাঁর পাশে বসেছি এ-কথাটা আমি এক নিমেষের জন্যও ভুলতে পারলাম না। বুকের মধ্যে অসহ্য বিদ্যুৎস্পর্শ আমাকে নিঃসাড় ক'রে রাখলো—তাঁর মনের কথা জানি না—তিনি বাইরে মুখ ফিরিয়ে থাকলেন। আমার বাড়ির রাস্তা পেরিয়ে গেলো—আমি নামলাম না—মনে-মনে ভাবলাম এই চলাই কেন আমার শেষ চলা হয় না, ইনি যখন উঠে যাবেন আমার পাশ থেকে, তার পরেও কেন আমি বেঁচে থাকবো—কেন আমি সেই সঙ্গেই লুপ্ত হ'য়ে যাবো না এই দুঃখ আর ব্যর্থতায় ভরা পার্থিব সংসার থেকে।

এক সময় স্মিতহাস্যে তিনি বিদায় নিলেন। আমি দুই তৃষিত চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে—কোথায় গেলেন তিনি ? কত দূর তাঁর বাড়ি ? কোন রাস্তা ? কত নম্বর ? কিছুই আমার জানা হ'লো না। আমি কোথায় যাবো তাও তিনি জানলেন না—এই বিরাট শহরে আবার কবে আমি দৈবের দয়ায় তাঁর

দেখা পাবো, কে ব'লে দেবে সে-কথা? তাঁর পাশে যতক্ষণ ব'সে ছিলাম, বুকের কম্পনের সঙ্গে-সঙ্গে এ-ইচ্ছেটা আমাকে কত বার পীড়া দিয়েছে—কিন্তু আমি কিছুতেই জানতে চাইনি তাঁর ঠিকানা কী। আমি জানি তাহ'লে আবার আমার অজান্তেই প্রত্যহ সেই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবো—দিনান্তে তাঁকে দেখবার লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারবো না।

একুশ বছর বয়সে বিয়ে করেছি। একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম—কাব্যে বর্ণিত কবির মতো আমার স্বভাব। বন্ধুদের সঙ্গে সময়ে অসময়ে আড্ডা দিয়েছি, কখনো নিরালা নির্জনে ব'সে একা-একাই সমস্ত রাত কাটিয়েছি—মনে হ'লে সমস্ত দিন বন্ধ ঘরে কবিতার বই বুকে নিয়েও দিন কেটেছে। ছাত্র হিসেবে তুখোড় ছিলাম—কিন্তু অনিচ্ছার জোরে পরীক্ষার ফল কিছুতেই ভালো করিনি। শুনেছি আমি জিনিয়স। হ'তে পারে। এক সময়ে বাঁ হাত দিয়েও যা লিখেছি তাই নিয়েই তো ছাত্রমহল মেতে উঠেছে। আমার আকার-প্রকার নকল করবার লোকেরও অভাব ছিলো না। আমি মানুষটা উদ্দাম—সলজ্জ-সুকণ্ঠ হওয়াকে আমি কাপুরুষতা মনে করেছি। অল্প বয়সে মা মারা যান, বাবা ছিলেন স্নেহশীল—ইচ্ছাতে বাধা না-পেয়ে-পেয়ে উদ্দামতা যখন চরমে ঠেকলো তখুনি বাবা বিয়ে দিলেন। কিছু যে অনিচ্ছা ছিলো তাও না—কোনো স্বপ্নও ছিলো না। শুনলাম বৌ সুন্দরী। কৌতূহল বোধ করলাম না। সুন্দর মেয়ের প্রতি আমার লোভ ছিলো না—আসলে কোনো মেয়ের প্রতিই আমার লোভ ছিলো না। মেয়েরা আমার কাছে খেলার মতো। আমি জানতাম ইচ্ছে করলেই তাদের জয় করতে পারি—সে-জয়ে কোনো কৃতিত্ব ছিলো না-ব'লে তার প্রতি আকর্ষণ আমার শিথিল ছিলো।

বিয়ের প্রথম রাত্রে প্রদীপের স্বল্পালোকে আমি যখন করুণাকে দেখেছিলাম, ভালো লেগেছিলো। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে ছিলাম তার দিকে, কিন্তু স্পর্শ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার সমস্ত উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এলো—আমি তখুনি জেনেছিলাম এ আমার চাওয়ার পাওয়া নয়—কী চাই তা জানি না, কিন্তু আমি যে পেলাম না তা বুঝেছিলাম। একটি মেয়ের শরীরের স্বাদ নিতান্ত জৈব কারণেই আমাকে আকর্ষণ করলো—অপূর্ব অনির্দেশ্য কোনো ঐশ্বরিক আনন্দ আমি সেখানে আবিষ্কার করতে পারলাম না। তারপরে আমি যখনই করুণাকে আদর করেছি, ওর লাল রংয়ের পাৎলা ঠোঁটে চুমু খেয়েছি, নরম শাদা সুঠাম শরীরের আলিঙ্গনে

নিজেকে নিষ্পেষিত করেছি, একটা দুর্নিবার অভাববোধ তখনি আমাকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কী যেন নেই ওর মধ্যে। কয়েকদিনের মধ্যেই বৌয়ের প্রতি আমার অমনোযোগ স্বজনদের চক্ষুশূল হ'লো। বাবা বললেন, এমন বারমুখো ছেলেকে নাকি কোনো মেয়েই ঘরে বাঁধতে পারে না। তা নইলে এমন লক্ষ্মী—

আমি জানি ও ভালো মেয়ে। শান্ত, বাধ্য, নম্র—আমার প্রতি ওর অখণ্ড মনোযোগ। ও জানে আমি ওর স্বামী—ইহকাল পরকালের পরম দেবতা। আমি এ-ও জানি বিপদের দিনে করুণার চাইতে বড়ো বন্ধু আমার কেউ নেই—আর সেইজন্য আমিও ওকে দয়া করি, মমতা করি, স্নেহ করি, কিন্তু আকর্ষণ বোধ করি না। আমার অশান্ত আত্মার সহচরী ও নয়—ও হ'তে পারে না, ওর মধ্যে আমাকে আকর্ষণ করবার মতো তিলতম শক্তিও নেই। কিন্তু করুণা অসুখী হ'লো না। বরং ওর মনে হয়েছিলো স্বামীভাগ্যে ও কোনো-কোনো মেয়ের ঈর্ষাভাজনই হ'তে পারে। স্বামী সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি ওর জানা ছিলো। দুশ্চরিত্র হবে না, মদ খাবে না, স্ত্রীকে অকারণে গালিগালাজ করবে না—কিনে-কেটে এনে দেবে, সিনেমা-থিয়েটারে নিয়ে যাবে—বলাই বাহুল্য, ইচ্ছায় না হোক অনিচ্ছায়ও আমি ওর প্রতি এই কর্তব্যগুলো পালন করতাম। আমি জানি ওকে যে আমার মনটা দিতে পারলাম না সে-জন্য ওর দুঃখবোধ নেই, কিন্তু আমার আছে—আমি তাই এ-ভাবেই ওকে সুখী করবার চেষ্টা করলাম।

'পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের আঁচলধরা না-হওয়াই ভালো।' এ উক্তি আমার স্ত্রীর মুখে প্রায়ই শুনেছি। ননদিনীদের সঙ্গে নিন্দাচর্চার আসরে ও প্রায়ই বলতো, পুরুষমানুষ যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণই নিরিবিলি। কোনো-একদিন অভিমানভরে বলেছিলাম, 'আমি যত দূরে থাকি ততই তাহ'লে ভালো?'

স্ত্রী বিগলিত হ'য়ে বললো, 'না গো না—স্বামীসঙ্গের মতো পুণ্য আছে না কি?'

পুণ্য! মনটা নিমেষে বিষ হ'য়ে গেলো। আমি কি ওর পুণ্যের কাণ্ডারী হ'য়েই থাকতে চাই? আমার মুখের পরিবর্তনে ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'রাগ করলে?'

'না।'

'তবে মুখ অমন করলে কেন?'

'এমনি।'

'না, এমনি না, আমি জানি আমাকে তোমার একটুও পছন্দ হয়নি। আমি

যা বলি তা-ই—' কথা শেষ না-ক'রে ও চোখে আঁচল দিলো। বিরক্তিতে আমার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হ'য়ে উঠলো।

ঘন-ঘন ছেলেপুলে হ'তে লাগলো আমাদের। বছর-বছর সন্তানধারণের চাপে, আর পালনের চাপে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা করুণা আরো সুদূর ক'রে আনলো। ক্রমে রাত্রিবেলা একসঙ্গে শোওয়া ছাড়া অন্য সহযোগিতা প্রায় মুছেই গেলো আমাদের জীবন থেকে। মনে করেছিলাম সাহিত্যিক হ'য়ে জন্মেছি—বিধাতার প্রচণ্ড আশীর্বাদের অধিকারী হয়েছি, অতএব আমার জীবন অন্য সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। আমি আলাদা—আমি অনন্যসাধারণ—আমি কি মিশে যেতে পারি সংসারের ভিড়ে? সহস্র সঙ্গের মধ্যেও আমি একা। কিন্তু কার্যকালে সবই উল্টে গেলো। বছরে চারটা গল্প লিখে, সময়-সুযোগ মতো ব'সে-ব'সে পাঁচ মাস ধ'রে একখানা উপন্যাস রচনা ক'রে ছেলেদের দুধ জোটানো সম্ভব হ'লো না। বরং লিখে-লিখে যে-কাগজ নষ্ট করবো তা বিক্রি করলে তিন দিনের বাজার আসতে পারে। শান্তস্বভাব করুণা মাতৃত্বের ফলে খিটখিটে হ'য়ে উঠলো। প্রতিভা কথাটা তার বুদ্ধির অগম্য—মানুষকে সে ধন দিয়ে জন দিয়ে আর প্রচলিত অর্থে বিদ্যা দিয়ে বিচার করে। আমার মধ্যে এই তিনটিরই অভাব আস্তে-আস্তে তাকে পীড়া দিতে লাগলো। আমি যখন উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি, কোনো বই পড়তে-পড়তে আমার মন যখন একটা অপার্থিব আনন্দে আর দুঃখে অভিভূত হ'য়ে ওঠে—মনে-মনে যখন আমি মহৎ একটি সৃষ্টির প্রেরণায় নিঝুম হ'য়ে ব'সে থাকি, ও তখন ছেলে ঘুম পাড়াতে-পাড়াতে আমাকে বকে—অলস, নিষ্কর্মা, বিদ্যাহীন। হঠাৎ সচকিত হ'য়ে মুখের দিকে তাকাই—মৃত্যুর মতো একটা হিমশীতল স্পর্শ যেন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে আমার বুক বেয়ে-বেয়ে কোথায় নেমে যায়। গলা বন্ধ হ'য়ে আসে। কিছু বলি না, চুপ ক'রে উঠে দাঁড়াই, তারপর জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে। যখন ফিরি তখন করুণার শ্রান্ত শরীর ঘুমের আবেশে গভীর।

হয়তো আমাদের বছর-বছর ছেলেপুলে হ'তো না, যদি করুণার সঙ্গে সম্পর্কটায় আমার মনেরও কিছু যোগাযোগ থাকতো। ওর সঙ্গে কথাবার্তার পরিধি আমার এতই সংক্ষিপ্ত ছিলো যে বন্ধুতার কোনো অবকাশই আমি সেখানে খুঁজে পাইনি। চেষ্টা করেছি, ফল হয়নি। আমাকেও স্বামী হিশেবেই দেখতো, মানুষ হিশেবে নয়। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কর্তব্যপালনে সে বিমুখ ছিলো না ব'লেই ছেলেপুলের সংখ্যা একটু বেড়ে গিয়েছিলো। ও যদি আমার সঙ্গে একটু ঝগড়াও করতো, নিজের

অস্তিত্বটা জানাবার জন্ম যদি তিলপরিমাণ পরিশ্রম করতো, তবু যেন আমি কিছু খুঁজে পেতাম ওর কাছে, কিন্তু সে-দিকটা ওর বোবা। দোষ ওর নয়, আমারই। আমিই সকলের চাইতে অদ্ভুত, ও তো আর সকলের মতোই। হয়তো একজন সাধারণ স্বামীর পক্ষে ওর মতো স্ত্রী পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের কথা হ'তো—আমার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েই এমন হ'লো। আসলে বিয়ে করাই আমার উচিত ছিলো না। অপেক্ষা করা উচিত ছিলো সেই মেয়ের জন্য যার পদক্ষেপে আমার সমস্ত জীবন ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতো—যে সত্যিই আমাকে ফোটাতে পারতো। মা-পাখি যেমন তা দিয়ে তার সন্তানকে ফোটায়, স্বামীকে বিকশিত করতে স্ত্রীরও ঠিক ততখানি উত্তাপেরই প্রয়োজন। এ দুটোই কি সমান পর্যায়ে পড়ে না? জীবনের সমস্ত আনন্দ-উপভোগেই কি একজন মেয়ের সংস্পর্শ অপরিহার্য নয়? ভালোবাসাই আমাদের মানুষ করে—তার অভাবে জীবন শুষ্ক, ব্যর্থ। আমি সাংসারিক জীবনে অতি হতভাগ্য—অতি ব্যর্থ। আমার এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমি সততই সচেতন ছিলাম। আমার কিছুই ভালো লাগতো না।

প্রথম ছেলেটির জন্ম আমাকে অনেকখানি শান্তি দিয়েছিলো, কিন্তু দু'বছর বয়সে তার মৃত্যু হলো। তখন আমার দ্বিতীয় সন্তান দশ মাসের। পাগলের মতো মেয়েটিকে আমি ভালোবাসলাম—সেই সময়েই আমার জীবনে যেন একটু ভারসাম্য এলো। বাবার শত দাঁত-কড়মড়ানিতেও যা হয়নি—করুণার হাজার কান্নাতেও যা হয়নি—মেয়ের সুখসুবিধা বিধানের জন্ম আমি তা-ই করলাম। সাধারণভাবে বি. এ. পাশ করেছি, কাজ পাওয়া সহজ ছিলো না—আমি যে অসাধারণ—আমি যে প্রতিভাবান—ঈশ্বর যে আমাকে অন্ত সকলের চাইতে আলাদা ক'রে সৃষ্টি করেছেন, সে-কথা কেউ বুঝলো না—সকাল-সন্ধ্যা ঘর্মাক্ত হ'য়ে আর-পাঁচজন মানুষের মতোই দু'মাস হাঁটাহাঁটি ক'রে অনেক দরজা থেকে অনেক অপমান সঞ্চয় ক'রে অবশেষে পঁচানব্বুই টাকার একটি চাকরি জোগাড় ক'রে নিলাম। করুণার মুখে হাসি ধরে না, খানিকক্ষণের জন্ম সে তার মৃত পুত্রকেও ভুলে' গেলো। স্বামীর সুমতিতে দু'হাত জোড় ক'রে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করলো সে।

সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আপিশের সেই আলো-জ্বালা বদ্ধ ঘর আমার জীবনে বাকি রসটুকুও আখের কলের মতো নিংড়ে নিতে লাগলো—হাজারো কথার হাজার দ্যুতি সমস্ত আমি বিকিয়ে দিলাম মোটা-মোটা খাতার লম্বা-লম্বা হিসাবের স্তূপে। সে-কথা কেউ জানলো না—কেউ জিজ্ঞেস করলো না সে-কথা।

বরং কোনো-কোনো সকালের কোনো অপরূপ আকাশ যদি বা কখনো আমাকে হাতছানি দিয়েছে, বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে অনির্দেশ্য অব্যক্ত একটা সুখের অনুভূতিময় চিত্ত নিয়ে যখন আমি একটি প্যাডের পাতার উপর কলম ছুঁইয়েছি, তখনি করুণা হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এসে কলম কেড়ে নিয়েছে—'এই ক'রে-ক'রে চাকরিটি খোয়াবে তুমি। লিখতে বসলে তোমার চৈতন্য থাকে? বেলা ক'টা, জানো?' নরম ফুলের আস্তরণে ঢাকা সুগন্ধে ভরা কুঞ্জ থেকে যেন হঠাৎ লক্ষ-লক্ষ সাপ এসে আমাকে পেঁচিয়ে ধরলো। সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো তাদের আলিঙ্গনে—ছাড়াবার উপায় নেই। আমার যন্ত্রণা হয়েছে, অসহ্য যন্ত্রণা—ছেলের মৃত্যুতেও আমার এত কষ্ট হয়নি। মনে-মনে ভেবে দেখেছি, এ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কষ্টের চাইতে বড়ো দুঃখ পৃথিবীতে আমার আর কিছুই ছিলো না তখন।

তার পরে আমার আরো দু'টি সন্তান হ'লো। চাকরিতে অভ্যস্ত হ'লাম, ন'মাসে ছ'মাসে একটি গল্প লিখতেও আলস্য বোধ করলাম। তারপর জীবনের সমস্ত শুভমুহূর্তকে নিয়তির পায়ে বিসর্জন দিয়ে যখন আর্থিক উন্নতির বেশ একটা বড়ো রকমের চূড়োয় এসে নিশ্বাস নিলাম, তখনি আমার সমস্ত জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষিত মানুষটি এসে দাঁড়ালেন আমার চোখের সামনে। সেনের সঙ্গে আমার অনেক কালের পরিচয়। চমৎকার লোক। তাঁর মধ্যে আমি আমারই পরিশোধিত সংস্করণ দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন ভদ্র, বিনয়ী অথচ তেজস্বী পুরুষ—আর আমি ছিলাম দুর্বিনীত দাম্ভিক কঠোর। আমি জানি তাঁর মতো সার্থক জীবন পেলে আমিও তাঁর মতোই নম্র হ'য়ে উঠতাম। পৃথিবীকে আমিও তাঁর মতোই ভালবাসতাম। আমার চোখেও প্রতিভার দীপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে নামতো প্রশান্তির ছায়া—শান্তি আর স্নেহের সমাবেশে আমার দৃষ্টিও গভীরতায় অতল হ'তো।

কারো বাড়ি যাওয়া, কারো সঙ্গে সংস্রব রাখা আমার জীবন থেকে মুছে গিয়েছিলো, কোনো-এক সভায় আমরা দু'জনে অনেক কাল পরে আবার একত্রিত হ'লাম। সেনকে দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। মৃদু-মধুর কথা আর সকুণ্ঠ সলজ্জ ভঙ্গিতে তাঁকে আমার এত ভালো লাগলো বলতে পারি না। সভার শেষে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন, আমি বিনা দ্বিধায় আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজটি নিঃশব্দে সম্পন্ন করলাম। খুশিতে

উজ্জ্বল হ'য়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। অত্যন্ত আবেগভরে আমার অতীত কীর্তির সুখ্যাতিতে মগ্ন হ'য়ে উঠলেন। দু'জনের যেখানে একই পেশা, সেখানে কেমন একটা রেষারেষির ভাবই সর্বত্র দেখেছি এবং আমি নিজেও যে এই ঈর্ষা থেকে মুক্ত ছিলাম তা বলতে পারি না, কিন্তু সেনের এই ঈর্ষা থেকে অকুণ্ঠ মুক্তি আমাকে অবাক করলো। একটু পরেই যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখেই বুঝলাম ইনিই সেনের স্ত্রী। সেন আগ্রহভরে বললেন, 'এসো, তোমার প্রিয় লেখকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।'

আমি যুক্তকরে তাঁকে অভিবাদন জানালাম। আলাপের প্রথম অধ্যায় শেষ ক'রে তিনি বসলেন। রোগা ছিপছিপে শ্যামল রংয়ের মহিলা—শাদাশিধে শাড়ি আর ব্লাউসে আবৃত শরীর—পায়ে লাল কারপেটের চটি। কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তবুও তিনি যে এসেছেন সে-অস্তিত্বে ঘরটিও যেন সচেতন হ'য়ে রইলো। ভদ্রমহিলাদের দেখলেই আঘাত ক'রে উপেক্ষা ক'রে কথা বলা আমার স্বভাব। কিন্তু সেদিন আমি অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে হাতে হাত ঘ'ষে ঈষৎ হাস্য ছাড়া আর কিছুই করিনি। অনুরাধা দেবী অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে দু' একটি কথা বললেন, বলবার জন্যেই বললেন না জানবার জন্যেই বললেন। অত্যন্ত ঔৎসুক্য নিয়েই তিনি আমার সাহিত্যিক জীবনের তথ্য জানতে চাইলেন। তাঁর আন্তরিকতার মূল্য আমি অস্বীকার করতে পারলাম না।

যখন বাড়ি ফিরলাম ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর যুক্ত জীবনের একটা পরম শান্তির হাওয়া যে আমাকেও স্পর্শ করেছে সেটা বেশ স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পেরেছিলাম। ওঁরা যে সুখী, এ-কথাটা আমার বুকের মধ্যেও যেন একটা সুখের আবেগ আনলো। চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ওঁদের কথাই ভাবলাম। সেনের সুন্দর জীবনের পিছনে যে অতখানি শান্তি আছে তা ভেবে ভালো লাগলো। যে-অভাববোধে নিজে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছি তা থেকে একজনকে মুক্ত দেখে আনন্দ হ'লো। মনে-মনে বললাম, 'ঈশ্বর, ওদের সুখ অক্ষুন্ন করো।'

শনিবার আপিশ তাড়াতাড়ি ছুটি হ'লো, এবং কোনো-এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে আবার সেনের বাড়িতে টেনে আনলো। দু'জনের আন্তরিক অভ্যর্থনায় আমি অভিনন্দিত হলাম। সময়ের উপর এঁরা সীমা টানেননি, বন্ধুতার উত্তাপে আমাকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অভিভূত ক'রে রাখলেন। সহসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমিই উঠে দাঁড়ালাম। দরজা পর্যন্ত এসে ওঁরা আমাকে বিদায় দিলেন, আমি সেই অবকাশে অনুরাধা দেবীকে ভালো ক'রে দেখলাম।

তাঁর মাঝারি আকারের দুটি চোখের তারার ঔজ্জ্বল্য আমার অন্তরকে বিদ্ধ করলো। আমি জানলাম, এই সেই মেয়ে, সমস্ত জীবন ধ'রে আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অত্যন্ত নির্দোষ ভালোবাসা! যিনি আমার আত্মার প্রিয় অধীশ্বরী তাঁকে যে আমি আমার দৈহিক জীবনে পেলাম না, এ নিয়ে আমার মনে কখনো কোনো অভিযোগ আসেনি, কিন্তু তাঁকে আমি না-দেখেও থাকতে পারতাম না। তিনি যে আমার —এ-কথাটা যেন হৃদয়ের গভীরে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা হ'য়ে গেলো।

আমার কত ব্যর্থ সন্ধ্যা আবার মধুরতায় ভ'রে উঠলো ওঁদের সংস্পর্শে। আমি আবার মানুষের মতো বাঁচতে আরম্ভ করলাম। চাকরি আর নীরস বিবাহিত জীবনের বাইরে আমার জন্য একটি স্বর্গ রচনা করলেন অনুরাধা দেবী। তাঁর কথা, তাঁর ব্যবহার, তাঁর ব্যক্তিত্ব সমস্তটা মিলিয়েই তিনি, তাঁর সমস্ত-কিছুই আমার জীবনের পরম কেন্দ্র—আমার জীবনের নতুন অধ্যায়। যতক্ষণ তাঁদের কাছে থাকতাম, সেনের সুখী জীবনের আভা আমাকে উদ্ভাসিত করতো, অনুরাধা দেবীর পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি আমাকে সম্মোহিত করতো। সময় যে কেমন ক'রে গড়াতো আমি জানি না—নিতান্তই না-উঠলে নয় এমন একটি সময়ে নিজেকে জোর ক'রে আমি বিচ্ছিন্ন করতাম। বাড়ি ফিরে ঢাকা ভাত খেয়ে শুতে যেতাম, করুণা ঘুমের মধ্যেই আড়মোড়া ভেঙে বলতো, 'এলে? রোজ-রোজ এত' রাত ক'রে ফেরো কেন?' আমি জানি, এ-কথা সে জবাবের প্রত্যাশায় বলেনি, পুরুষমানুষ সন্ধেবেলা তাস-পাশা খেলতে বেরোবেই, তাই নিয়ে অকারণ অভিমান তার ছিলো না। আমার সেটাও একটা বাঁচোয়া ছিলো। শুতে-শুতে রাত বারোটার বেশি হ'তো—শুয়েও আর ঘুম আসতো না। আমার চোখকে অনুরাধা দেবী তাঁর রোগা ছিপছিপে শরীরটি দিয়ে ভ'রে রাখতেন। আমি মনে-মনে তাঁর স্পর্শ অনুভব করতাম—তাঁর সান্নিধ্য-স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে প'ড়ে থাকতাম, তারপর হঠাৎ আমি যেন আর-একটা মানুষ হ'য়ে উঠতাম—আমরা দু'জনে যেন একই আত্মা, একই দেহ। এতক্ষণে সেন যে অনুরাধা দেবীকে নিয়ে এক শয্যায় শুয়েছেন, অনুরাধা দেবী যে তাঁর প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে এতক্ষণে তাঁকে ভ'রে তুলেছেন; নিরালা নিভৃত হ'য়ে ওঁরা পরস্পর যে পরস্পরের মধ্যে বিলীন হ'য়ে গেছেন—এ-কথা কল্পনা করতে-করতে হৃদয়ে ঘন-ঘন কম্পন হ'তো - বুকের মধ্যে কে যেন আমাকে ব'লে দিতো, সে-সুখ আমার সে-সুখ আমারই।

এ-সময়টায় সত্যি আমি সুখী হয়েছিলাম। খুব সুখী! সমস্তটা দিন গেলেই যে সন্ধ্যা, এ-কথাটা আমাকে নতুন জীবন দিলো। নতুন প্রাণের অঙ্কুরে আমি আবার সতেজ হ'য়ে উঠলাম। আপিশের হিশেবের খাতার স্তূপেই আমি আবার আমার স্বপ্ন খুঁজে পেলাম—আমার বহুদিনের বিরহশীর্ণ খাতার পাতা আবার কালো কালির অক্ষরে ভ'রে উঠলো। অনুরাধা দেবীর সাগ্রহ অভ্যর্থনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো আমার জীবন।

শুধু চোখে দেখা, আর কাছে থাকা, এর বাইরে আমার ইচ্ছা যেতো না, আমার দৃষ্টি কখনো বিহ্বল হ'তো কিনা জানি না – কিন্তু কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলাম অনুরাধা দেবী যেন হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেছেন। আমি আর সেন যুক্ত হ'য়ে তাঁকে ঠাট্টা করতাম, তাঁর আনন্দের উপাদান হবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তাঁর চোখে বেদনার ছায়া দেখা দিলো। কোনো-এক স্তব্ধ দুপুরে কাজ করতে-করতে হঠাৎ সেই চোখ আমাকে ডাকলো—আপিশ করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। অদম্য ইচ্ছার বেগে আমি বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। অনেক ভাবলাম, শাসনের আঘাতে অনেক ক্ষতবিক্ষত করলাম হৃদয়কে। কিন্তু তবু এক সময় আমি সেনের সেই অপরিসর বসবার ঘরটিতে নিজেকে আবিষ্কার ক'রে ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠলাম। বলাই বাহুল্য, সেন বাড়ি ছিলেন না—ঘুম-ভাঙা চোখে অনুরাধা দেবী উঠে এলেন। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'বসুন।'

আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে—ঈষৎ রক্তাভ চোখে কিসের ছায়া? চোখে চোখ পড়তে তিনি মাথা নিচু করলেন, আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হ'য়ে উঠলো। মুহূর্তকাল দু'জনেই চুপ ক'রে ছিলাম। অনুরাধা দেবীই বললেন, 'ভাবছি কোথাও বাইরে যাবো।'

'বাইরে! কেন—' আমার গলায় বিচ্ছেদের ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিলো। তিনি পরিষ্কার গলায় বললেন, 'ভালোবাসার শক্তি অসীম। তার আকর্ষণ মৃত্যুর মতো অনিবার্য।'

'অনুরাধা দেবী– '

'আমি জানি, আপনি আমাকে ভালবাসেন।'

'অনুরাধা—'

'তার দুর্নিবার টানে আমার মতো সুখী জীবনও বিপর্যস্ত হ'য়ে যেতে পারে—হৃদয়কে বিশ্বাস নেই।'

'আপনি বলছেন কী ?'

'আপনিও কি তা-ই বলেন না ?'

মাথা নিচু করলাম। একটু থেমে অনুরাধা দেবী বললেন, 'আমার স্বামীর ভালোবাসা অতলস্পর্শী—আর আমি তাঁকে কত ভালবাসি তাও তাঁর অজানা নয়, তিনি ব্যথা পেলে তাঁর হাঁটবার জন্য আমি বুক পেতে দিতে পারি, তাঁকে দুঃখ দিয়ে পৃথিবীর কোনো সুখই আমি প্রার্থনা করি না। আমি স্ত্রীলোক হ'য়ে এমন কথাও মনে-মনে ভাবি, তিনি যে-রকম নির্ভরশীল অসহায় মানুষ তাঁকে ফেলে যেন আমার মৃত্যুও না হয়, কিন্তু—'

আমি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। নিজেকে প্রচণ্ড শক্তিতে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য পা বাড়ালাম, হঠাৎ তাঁকে স্পর্শ করবার একটা দুরন্ত স্পৃহা আমাকে পাগল ক'রে তুললো। মুহূর্তের ভ্রান্তিতে আবার ফিরে দাঁড়ালাম, তাঁর দিকে তৃষিত চোখ মেলে দেখলাম তাঁর চোখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। যুক্ত দুটি হাত মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। আমি মানুষ, তিনি দেবী—তাঁকে আমি ছোঁবো কেমন ক'রে ? বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। আস্তে-আস্তে তিনি যুক্ত কর খুলে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমাকে স্পর্শ ক'রে বলুন এই দেখাই শেষ দেখা হোক।'

নিঃশব্দে আমি তাঁকে স্পর্শ করলাম, তারপর শিথিল পায়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

তারপর এই দু বছর পরে আবার তাঁকে দেখলাম আমি।

দু'বছর কতটুকু সময় ? দু'শো যুগ কাটলেও কি আমি আমার আত্মাকে ভুলে যেতে পারি ? তিনিই তো আমার আত্মা ! তিনি তো সততই আমার হৃদয়ে আছেন।—তবু—তবু কেন জ্ব'লে যায়, পুড়ে-পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, কেন এই চকিত দেখায় আবার হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। হে আমার অশান্ত আত্মা, শান্ত হও, স্তব্ধ হও। একটু—একটুখানির জন্য ভুলে' যেতে দাও সব।

বিচিত্র হৃদয়

আমার বাবা ছিলো না। এই অভাববোধটা খুব ছোটো থেকেই আমাকে বারংবার আঘাত করেছে। মাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তাঁর বিষণ্ণ মুখ আরো বিষণ্ণ ক'রে ধরা গলায় জবাব দিয়েছেন, তিনি স্বর্গে। স্বর্গ কোথায়, স্বর্গ কী, কতদূরে—অনেকদিন ভেবেছি, কিন্তু সে-প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। আমার মা-র মুখশ্রী অতি সুন্দর, সমস্ত মুখখানাতে তাঁর এমন একটা মধুর বিষণ্ণতার আভা ছড়িয়ে থাকতো যে কোনো-কোনো সময় অপলকে সে মুখের দিকে তাকিয়েও আমার দেখার তৃষ্ণা মিটতো না। তিনি কালো-পাড় শাড়ি পরতেন, হাতে সরু-সরু দু'গাছা বালা ছিলো—গলায় প্রায়-অদৃশ্য একছড়া সোনার হার চিকচিক করতো। কী যে সুন্দর দেখাতো তাঁকে—মসৃণ শ্যামল রংয়ে একটা বর্ষার সজল আভা ছিলো—আমি ফর্সা ছিলুম, কিন্তু তবু সকলে বলতো মা-র শ্রী আমি পাইনি। অত্যন্ত শান্ত আর দৃঢ় ছিলো তাঁর স্বভাব। আমি তাঁর অতি অল্প বয়সের একমাত্র সন্তান।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তাঁর জীবনের সমস্ত আলো নিবে গিয়েছিলো। দাদামশায় ছিলেন সনাতনপন্থী—কাজেই বারো বছর বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়ে খুব একটা তৃপ্তিলাভ করলেন। বিয়ের পরে প্রথম বছর মা-র প্রায় পিত্রালয়েই কেটেছিলো। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে আমার সম্ভাবনার সূত্রপাতেই আমার বাবার মৃত্যু হ'লো। শোকে আমার মা কতটা মুহ্যমান হয়েছিলেন আমি জানি না, কিন্তু আমার দাদামশাই এ-আঘাত সামলাতে পারলেন না, এক বছরের মধ্যে তিনিও গত হলেন। মা-র আর দিদিমার পরিচর্যায় আমি বড়ো হয়েছিলুম—কোনো পুরুষের সংস্রব আমাদের ছিলো না; দু'একজন আত্মীয়ই যা আসা-যাওয়া করতেন—আর অসুখ করলে ডাক্তার। স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাজ একা আমার মা-কেই করতে দেখেছি। বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে সব সময়েই তিনি অবিচলিত। দিদিমা যত না বুড়ো হয়েছিলেন তত হয়েছিলেন রুগ্ন—আর্থিক সচ্ছলতার অভাবও ছিলো প্রচুর, কাজেই কাজকর্ম সবই প্রায় মা-কে করতে হ'তো। সকালে উঠেই তিনি একেবারে কলের মতো নিঃশব্দে কাজে লেগে যেতেন—তারপর নির্দিষ্ট সময়ে

কলেজ এবং ফিরে এসেই আবার কাজের আবর্ত। বাচ্চা একটি থাকলেই যথেষ্ট—তার উপর আমার মা ছিলেন আমার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী—তাঁর চোদ্দ বছরের মাতৃত্ব আমি দেখিনি, কিন্তু যে-বয়সের কথা আমার মনে আছে—তখনো আমার মা খুব বড়ো হ'য়ে যাননি—এখন সে-বয়সের মেয়েদের বিয়ের কথাও কেউ চিন্তা করেন না। আমার যখন ছ' বছর বয়েস মা তখন আই এ. পাশ করলেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ এক সকালে ঘুম ভেঙে আমি একজন ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে দেখতে পেলুম—যাঁর চেহারা আমার মনের মধ্যে সেই মুহূর্তেই একটি গভীর দাগ কেটে দিলো।

সুন্দর লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ যা মানুষকে টানে—অত্যন্ত নিচু স্বরে কথা বলেন আর এমনভাবে মাঝে-মাঝে চোখ রাখেন মুখের উপর যে চোখে চোখ ফেলতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। দিদিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি ঘরে যেতেই আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। আমি মিশুক ছিলুম না, বিশেষত কোনো পুরুষের সংস্রব বঞ্চিত হয়ে মানুষ হবার দরুণ পুরুষ সম্বন্ধে আমার একটা অহেতুক ভয়ও ছিলো, কিন্তু তবুও আমি ঐ ভদ্রলোকের মৃদু আকর্ষণেই একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকালুম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুন্দর ক'রে হাসলেন, তারপর পকেট থেকে লাল ফিতেয় বাঁধা এতো বড়ো এক বাক্স চকোলেট বার ক'রে আমার হাতে দিলেন। নেবো কি নেবো না ভাবছিলুম হয়তো, এমন সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে আমার মা ঢুকলেন ঘরে এই প্রথম তাঁর মাথায় কাপড় দেখলুম। কেমন একটা সলজ্জ সসংকোচ ভঙ্গিতে তিনি ভদ্রলোকের হাতে চা-টা দিয়েছিলেন সেই দৃশ্যটা আমার এখনো মনে পড়ে। দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই আগুন বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি, বাবা।' তাঁর চোখ সজল হ'য়ে উঠলো।

ভদ্রলোক মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—একটু সময়ের জন্য বোধ হয় তিনি অন্যমনস্কও হ'য়ে পড়েছিলেন—দিদিমার কথায় সতর্ক হলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমি জানতুম না আপনারা এখানে, দেশে ফিরেছি মাত্রই দশদিন—হঠাৎ পশু আপনাদের ঠিকানা পেলুম। সুময় আমার কতখানি ছিলো তা আপনাদের বোঝানো সম্ভব নয়। আমার বিলেত যাত্রার রাস্তাটা বলতে গেলে ও-ই সুগম ক'রে দিয়েছিলো—' আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম বলতে-বলতে তিনি মা-র মুখের দিকে তাকালেন আর মা-র

সাগ্রহ দৃষ্টি তখুনি নত হ'য়ে গেলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক—'আমার একটু দরকার আছে—আজ আর বসবো না।' নত হ'য়ে তিনি আমার দিদিমার পায়ের ধুলো নিলেন—মা র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কখনো ভাবিনি আপনাকে এ-অবস্থায় দেখবো। সবই ভাগ্য।' মা চুপ ক'রে রইলেন। আমি মা-র কাপড়ের আঁচল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলুম, আমার গালে মৃদু টোকা দিয়ে বিদায় নিলেন।

তাঁকে দেখার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপরে তিনি আবার এলেন, আবার এলেন—আমার জামা-কাপড়ের শ্রী বদলে গেলো, আমার মা-র মুখের বিষণ্ণতার পরিবর্তে ভ'রে থাকার একটা অদ্ভুত আভা দেখা দিলো—ক্রমে ক্রমে সংসারে যেন একটা নতুন আলো অনুভব করতে লাগলুম। শেষে আস্তে-আস্তে এমন হ'লো যে তিনিই এ-বাড়ির অভিভাবক হ'য়ে উঠলেন। মাকে আর অত পরিশ্রম করতে দেখতুম না, আমার পরিচর্যার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একজন স্ত্রীলোক এলো, বাড়িতে রাঁধবার জন্য ঠাকুর এলো—বাইরের কাজ করবার জন্য চাকর রাখা হ'লো। প্রথমটায় দিদিমা ও মাকে প্রায়ই এ নিয়ে নানারকম ওজর আপত্তি আর অভিযোগ করতে শুনেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সেই জেদ তাঁরা বজায় রাখতে পারেননি। আমার মা র আত্মমর্যাদা ছিলো অসাধারণ, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বময় অসাধারণ মানুষটির হৃদয়-বৃত্তির কাছে নিশ্চয়ই তিনি হার মেনেছিলেন। একখানা ছোটো অস্টিন গাড়ি ছিলো ভদ্রলোকের, সকালে-বিকালে সেই গাড়িখানা নিজেই চালিযে তিনি আসতেন। সকালের দিকে তিনি সবশুদ্ধ পনেরো মিনিটও হয়তো থাকতেন না—কেবল একটা খোঁজ-খবর নেযা—তাঁর পায়ের শব্দ পেলেই মা-র মুখে একটা আলো ছড়িযে পড়তো—হাতের কাজ শিথিল হ'য়ে উঠতো, অকারণে এক কাজ থেকে আরেক কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করতেন। আমি চুপি-চুপি কানের কাছে মুখ এনে বলতুম, 'সাহেব এসেছেন, মা।' প্রথম দিন তিনি স্যুট প'রে এসেছিলেন আর আমার মনে গেঁথে গিয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই সাহেব। তারপরে দিদিমা কত বুঝিয়েছেন যে ইনি একজন খাঁটি বাঙালি—আমার বাবার বিশেষ বন্ধু—তারপরে কতবার উনি ধুতি প'রে এসেছেন কিন্তু আমার মনের সেই সাহেবের ছবি কিছুতেই মুছে যায়নি। কাজ করতে-করতে মা ঈষৎ মুখ তুলে বলেছেন, 'আসুন। তুমি পড়তে বোসো গে।' এ-কথায় আমি দুঃখিত হ'য়ে যাই-যাই

ক'রেও ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতুম। এ-ভদ্রলোকের সান্নিধ্যের কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিলো আমার কাছে। এত দেখে-দেখেও তাঁর কাছে আমি সহজ ছিলুম না। সেই বালিকা বয়সেও আমি বড়ো মেয়েদের লজ্জা অনুভব করতুম। একটু পরেই ভদ্রলোক নিজেই মা-র ঘরে আসতেন। কেমন আছেন?' রোজই এক প্রশ্ন। আমি ভেবে পেতুম না এই তো কাল রাত দশটা পর্যন্ত দেখে গেছেন—আজ এটুকু সময়ের মধ্যে আবার কী হবে যে এই প্রশ্ন। মা-ও রোজকার মতোই মাথা নিচু ক'রে জবাব দিতেন, 'ভালোই।' একটু চুপচাপ কাটতো। তারপর মা চোখ তুলে তাকাতেন— আমি দেখতাম ভদ্রলোকও তাকিয়ে আছেন মা-র দিকে। তাঁদের দু'জনের মিলিত দৃষ্টির এমন একটা অনুভূতি আমার অপরিণত মনের মধ্যে ক্রিয়া করতো যে দু'জনকে দু'জনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আমি অস্থির হ'য়ে উঠতুম। মা তক্ষুনি বুঝে ফেলতেন আমার মনের কথা। সতর্ক হ'য়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসতো তাঁর মুখ দিয়ে। ভদ্রলোক বলতেন, 'কী হবে।' মা জবাব দিতেন না -আমার আঁচড়ানো মাথায় হাত দিয়ে ধীরে-ধীরে আরো পরিপাটি করতেন। তারপরে তাঁরা মৃদুকণ্ঠে আরো দু'একটা কথা বিনিময় করতেন –সে-সব কথার আমি মানে বুঝতে পারতুম না।

একদিন দিদিমা বললেন, 'তোমাকে বাবা আর কত কষ্ট দেবো, তুমি যা করলে—'

'ও-কথা বলছেন কেন?' ভদ্রলোক একটু আহত স্বরে বললেন, 'সুমন্ত্রর কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী ছিলুম। ঋণ তো কখনো শোধ হয় না, কিন্তু তবু যদি তার হ'য়ে কিছুটাও করতে পারি, সেইটাই আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ।'

'ও-কথা বোলো না –সে যদি তোমাকে কিছু ক'রেই থাকে তার একশোগুণ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো আমাদের। যে-সময়টায় তোমার দেখা পেয়েছিলুম—বলতে আর লজ্জা নেই যে সে-সময় আমাদের সম্ভ্রম রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছিলো।'

'আমাকে আপনি পর ভাবেন কেন? আমার এই উপার্জনে যে আপনাদেরও একটা ন্যায্য দাবি আছে সেটা কেন ভাবতে পারেন না। আত্মীয় হ'লে কি কখনো এমন কথা বলতে পারতেন কি ভাবতে পারতেন?'

'কথাটা যে কত সত্য তা আমি বুঝি। আত্মীয়রা সর্বদাই শত্রু, অথচ তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতেও আমাদের লজ্জা নেই, কিন্তু—'

'এর মধ্যে কিন্তু নেই। এবার তো আমাদের আরো দরকার বাড়ছে,' হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আমাদের বুলুমণিকে এবার ইস্কুলে দিতে হবে না? কী বলো, অ্যাঁ?'

আমি তখন আট বছরের হয়েছি। ঘাগরা দেয়া সুন্দর-সুন্দর ফ্রক পরি—দু'পাশে লাল রিবন দিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দি—আর সব সময় মনের মধ্যে কেমন একটা অহংকার বোধ করি। কয়েকদিন থেকে ইস্কুলে ভর্তি নিয়ে মা-র সঙ্গে কান্নাকাটি করছিলুম—এ-কথায় সুখী হ'য়ে লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে থাকলুম। ভদ্রলোক বললেন, 'খুব ভালো ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবো—ইস্কুলের বাস আসবে ভোঁ ক'রে—আর তুমি বেণী দুলিয়ে ছুটে গিয়ে উঠে বসবে। আমাদের তো তখন চিনবেই না।'

আমি একগাল হেসে লজ্জায় তাঁরই কোলের মধ্যে মুখ লুকোলাম।

'শোনো, শোনো—' আমি মুখ তুললাম না। এর পরে তিনি মা-র ঘরে গেলেন। আমি সেখানেই চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তাঁর বুকের কাছটায় মুখ রেখেছিলুম, তাঁর গায়ের সৌগন্ধ্য লেগে রইলো আমার প্রাণে।

তার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ইস্কুলে ভর্তি হ'য়ে গেলুম। লেখাপড়ায় আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিলো, ইস্কুলের আবহাওয়া আমার ভালো লাগলো। তাছাড়া বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ ছিলুম, এখানে অনেক মেয়ের বন্ধুতা, অনেক দিদিমণিদের স্নেহ আমার জীবনে যেন একটা নতুন জগৎ এনে দিলো। প্রথম বছরটা আমি ইস্কুলের বাস্-এ যেতাম, দ্বিতীয় বছরে আমাদের একখানা বড়ো গাড়ি এলো। আমাদের মানে ভদ্রলোকের। তাঁর ছোটো গাড়িখানাও ছিলো, সেটা তিনি নিজে ব্যবহার করতেন আর এ-গাড়ি রইলো আমাদের জন্য। মা ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বললেন, 'মিছিমিছি অর্থ নষ্ট, কী দরকার ছিলো আবার এ-গাড়িটা কেনবার?'

'শস্তায় পেলাম।'

'শস্তায় পেলেই সব যদি কিনতে হয় তাহ'লে—'

'চুপ করো তো—'

ইদানিং মা-কে তিনি তুমি বলতেন। আমার ভালো লাগতো না, কিন্তু

আমার তো কোনো হাত নেই। মা বললেন, 'আমি তো চুপ ক'রেই থাকি! কিন্তু সত্যি এ আমার ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা, তোমার ভালো না লাগে আমি আর বুলু ঘুরে বেড়াবো। কেমন?'

মা-র পিছনে দাঁড়িয়ে পেন্সিলের কাঠ চিবোচ্ছিলাম—মৃদু হেসে মুখ নামালাম। আমাকে সম্বোধন ক'রে উনি যখনই কোনো কথা বলেন ভিতরে-ভিতরে আমি যেন কেমন-এক রকমের শিহরণ অনুভব করি। আজ প্রায় তিন বছর ধ'রে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের এ-রকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—বলতে গেলে তিনিই বাড়ির কর্তা, অথচ একদিনের জন্য তাঁর মুখোমুখি আমি লজ্জা কাটাতে পারিনি—আজ পর্যন্ত তাঁকে আমি কোনো সম্বোধন করি না। আমার দিদিমা বলেন 'এ আবার কী! বাবার বন্ধু, তাছাড়া এমন মানুষ, কত ভালোবাসেন, কত যত্ন করেন, তার কাছে আবার লজ্জার কী আছে? কাকা ব'লে তো একদিন ডাকতেও শুনি না।'

মা বলেন, 'ও বুনো হ'য়ে গেছে, মা। জ'ন্মে থেকে তো মা আর দিদিমা—অন্য মানুষ তাই ওর বরদাস্ত হয় না।'

বরদাস্ত হয় না—এ-কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। সত্যিই তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন, এত যত্ন করেন, সংসারের সমস্ত সুখ আমাদের জন্যই আহরণ করেন তিনি, তথাপি আমি তাঁকে বরদাস্ত করতে পারি না। এমন নয় যে আমি তাঁকে ভালোবাসি না—তাঁকে পছন্দ করি না কিংবা তাঁর কোনো ব্যবহারই আমার মনের প্রতিকূল হয়েছে—বিশেষ ক'রে আজ জীবনের এইখানে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার উপলব্ধি করছি যে আমি তাঁকে দেখামাত্রই অতিরিক্ত ভালোবেসে ফেলেছিলুম ব'লেই তাঁর প্রতি আমার একটা অহেতুক বিদ্বেষ ভাবও ছিলো। আমার বয়সের মেয়ের প্রতি যতটা মনোযোগ দেয়া উচিত এবং যে-রকম মনোযোগ দেয়া উচিত, তিনি কেবলমাত্র সেটাই কেন দিয়েছিলেন সেটাই ছিলো আমার পরম হতাশার কারণ। আমার শিশু-মন যেটা বোঝেনি, আজকের অভিজ্ঞ মন দিয়ে সেটা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পারছি যে আমাকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্য কারো প্রতি তাঁর একতিল বেশি আসক্তিও ছিলো আমার পক্ষে দুঃসহ। মাত্র ঔচিত্যের মাপে যে-মনোযোগ তিনি আমাকে দিলেন, বন্ধুপত্নীর প্রতি সে-মনোযোগের প্রশ্নই উঠলো না—তাঁর জন্য তিনি সারা পৃথিবী জয় ক'রে আনতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। আমি আমার

শিশু-মনের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে প্রথম দিন থেকেই সেটা উপলব্ধি ক'রে ভিতরে-ভিতরে যন্ত্রণা পেতুম। হয়তো মা-র প্রতি আমি ঈর্ষাকাতরই হয়েছিলুম।

আস্তে-আস্তে বড়ো হ'তে লাগলুম। আমার সতেরো বছর বয়স হ'লো—সুখে সমৃদ্ধিতে সাচ্ছল্যে ভরা সংসারে আমার কোনোই দুঃখ ছিলো না, তবু আমার ভিতরে-ভিতরে কেমন একটা ভালো-না-লাগা-বোধ অবিশ্রান্ত আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। একদিন পড়তে-পড়তে হঠাৎ উঠে এলাম মা-র কাছে। মা সোয়েটার বুনছিলেন। মা-র নতদৃষ্টি সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর মসৃণ রংয়ের সুগঠিত দু'টি হাতের ওঠা-পড়া দেখতে দেখতে তাঁকে আমার সমবয়সী মনে হ'তে লাগলো। হঠাৎ চোখ তুলে তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কী রে?'

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বুনছো?'

'তোমার সাহেব-কাকার জন্য একটা সোয়েটার। কিছু বলবে?'

কোনো ভূমিকা না-ক'রে হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা মা, এ-ভদ্রলোক তো সত্যিই আমার কাকা নন, তবু কেন আমরা তাঁরটাই ভোগ করি?' মা চকিত হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এ-রকম একটা প্রশ্ন যে আমার মনে উঠতে পারে, এ-কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'সত্যি কাকা বলতে কী বোঝায় তা কি তুমি জানো?'

'বাবার বন্ধু, এই তো? কিন্তু বাবার বন্ধু বাবাও না কাকাও না—লোকে তাঁকে পরই বলবে। তাঁর গাড়ি চ'ড়ে ইস্কুলে যাই—তাঁর টাকা দিয়ে ভালো বাড়িতে থাকি—তাঁর দয়াতে ভালো-ভালো পোশাক পরি—আত্মসম্মানে লাগে আমার।'

হাতের সোয়েটারটা মা যেন ঝেড়ে ফেলে দিলেন, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'ভালো যিনি বাসতে জানেন তিনিই পরম আত্মীয়—ভালোবাসাই সম্মান—ভালোবাসাই জীবন—তার চাইতে বড়ো কিছু নেই।'

'লোকে যদি বলে—'

'লোকে কী বলে না বলে তা তোমাকে ভাবতে হবে না, বুলু।'

মরীয়া হ'য়ে বললাম 'কেন ভাবতে হবে না—লোক নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।'

'বুলু!' মা একটা মর্মভেদী গলায় আমাকে সম্বোধন ক'রে সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম। এত বছরের অভ্যস্ত জীবন সম্বন্ধে যে আমার মনে কেন এই অকারণ প্রশ্ন ধাক্কা দিচ্ছে, তা কি আমিই জানি? আট বছর বয়স থেকে যে-ক্ষোভ প্রতিদিন প্রতি পলে আমার মনের মধ্যে সযত্নে লালিত হয়েছে, এতদিনে তার একটা সুস্পষ্ট উপস্থিতিতে আমার সারা অন্তর ভ'রে গেলো।

বিকেলবেলা ভদ্রলোক যখন এলেন আমি লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হ'য়ে গিয়ে নিজের ঘরে লুকোলাম। ছ' বছর বয়স থেকে এই ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তাঁকে দেখছি, তাঁর যত্নে তাঁর ভালোবাসায়ই এই দেহ মন ভ'রে আছে, আর তাঁর সম্বন্ধে আজ আমি এত বড়ো কথাটা উচ্চারণ করেছি ভেবে দুঃখে বুক ভ'রে গেল। তিনি কি আমার পর? তিনি কি আমাদের দয়া করেন? তাঁর অর্থ কি কখনো সাহায্যের পর্যায়ে পড়ে? আমি জানলা দিয়ে তাঁকে উঠে আসতে দেখলাম। সেই দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, উন্নত চেহারা—ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা—আর এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল চামড়া। সহসা আমি আমার আঙুল গুনে-গুনে তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের হিশেব করলাম।

যথারীতি তিনি দিদিমার কাছে গিয়ে বসলেন। আমি আমার ঘর থেকেই সেটা অনুভব করলাম, কেননা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমি সেদিকেই নিবিষ্ট ক'রে রেখেছিলাম। দিদিমার শরীরের অবস্থা ভালো ছিলো না। কিছুদিন থেকে তিনি আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করেছি সেই ব্যাকুলতার সঙ্গে এই ভদ্রলোকেরও পরিপূর্ণ সায় ছিলো। কাছাকাছি ঘর—আমি তাঁদের কথোপকথনে কান দিলাম। দিদিমা বললেন, 'যদি তুমি ভালো মনে করো তাহ'লেই ভালো—আমি কী বুঝি।'

'তাহ'লে একদিন নিয়ে আসি ছেলেটিকে!'

'আনো। ওর মায়ের সঙ্গে কথা ব'লে দ্যাখো।'

'বুলুকেও জিজ্ঞেস করতে হয়।'

'বুলু!'—দিদিমা বোধ হয় একটু হাসলেন, 'ও আবার কী বোঝে?'

'না না, ওকে আপনি অবহেলা করবেন না। ওর মতো বুদ্ধিমান মেয়ে বিরল।'

'তোমরা দ্যাখো ওর বুদ্ধি। ওর মা-ই আমার কাছে শিশু, আর ও তো

তার মেয়ে।' আর অল্প দু' একটা টুকরো কানে ভেসে এলো, তারপরে তিনি উঠে এলেন মার কাছে।

মা-র ঘরসংলগ্ন ছোট্ট এক ফালি বারান্দা ছিলো—সেই বারান্দায় এসে জুতোর শব্দ থামলো—বুঝলাম, মা ব'সে আছেন সেখানে। অত্যন্ত মৃদু স্বরে ভদ্রলোক কী বললেন আমি বুঝতে পারলাম না, অত্যন্ত ক্লিষ্ট গলায় মা জবাব দিলেন, 'কিছু না।'

আমি অত্যন্ত নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দার পাশের ঘরে এসে বসলাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'বুলুর বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।'

'আমি কী বলবো, তুমি যা ভালো বোঝো তা-ই হবে।'

মা-র তুমি সম্বোধনে আমি আঁৎকে উঠলাম। যে-সন্দেহ আমাকে প্রতিদিন ক্ষয় করছিলো, মা-র সংযত আচরণ প্রতিমুহূর্তে তার বিরুদ্ধ সাক্ষী দিয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে এমন একটি প্রমাণও পাইনি যা থেকে সেই সন্দেহকে আমি রূপ দিতে পারি। সমস্ত শরীরে একটা বৈদ্যুতিক অনুরণন অনুভব করলাম।

'তোমার মেয়ে—'

অত্যন্ত উদাস গলায় মা বললেন, 'মেয়েই আমার—আর সবই তো তুমি করেছো—'

'তাহ'লে তোমার মত আছে কিনা, বলো।'

'আছে।'

'তোমার আজ কী হয়েছে?'

'তোমাকে একটা কথা বলবো।' মা-র গলা অত্যন্ত দৃঢ়।

'বলো।'

'এগারো বছর ধ'রে তুমি যত ঋণ দিয়েছো সব আজ আমি শোধ ক'রে দেবো।'

'ঋণ! মণি, ঋণ? আমি তোমাকে ঋণ দিয়েছি, আর সেই ঋণ তুমি আজ শুধে দেবে?' ভদ্রলোকের গলা ধ'রে এলো। মা বললেন, 'কেন এত করেছ তা তো আমি জানি—প্রতি মুহূর্তে যে-আবেদন তোমার চোখ দিয়ে তুমি আমাকে জানিয়েছো—সে-আবেদন আমি হৃদয়ের মধ্যে অনেক আগেই গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।'

'সামাজিক অনুষ্ঠান ? যা আমার প্রত্যহের স্বপ্ন—সমস্ত জীবনের বিনিময়ে একমাত্র যা আমার কাম্য—তুমি কি সত্যি সেই কথা বলতে চাইছো ?'

'হ্যাঁ। আমি মনস্থির করেছি—তোমার আমার যুক্ত জীবনকে এ-ভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখার কোনো যুক্তি নেই, সেটাই পাপ।'

'মণি, এ কি সত্যি ?'

'হ্যাঁ। এতদিন ঈশ্বর সাক্ষী ছিলেন, এখন মানুষকে সাক্ষী ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই—'

আমি ঘরের মধ্যে সহসা দুই কানে হাত চেপে ধরলাম, তারপর একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ছুটে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। দিদিমার মুমূর্ষু দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি কঁকিয়ে উঠলেন। 'কী, কী, কী হয়েছে ?' দুর্বল হাতে জড়িয়ে ধ'রে অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমি কান্নার বেগে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না—একটু শান্ত হ'য়ে বললাম, 'আমি বিয়ে করবো না, দিদিমা, বিয়ে ভেঙে দাও।' 'সে কী কথা—' আশ্চর্য হ'য়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি নির্লজ্জের মতো বললাম, 'যাকে মন দিয়েছি—তাকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।' আমার কথা শুনে দিদিমা হতবাক্ হ'লেন। আমাকে ঠেলে নিজের গায়ের উপর থেকে তুলতে চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বলছিস কী তুই ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।' আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমি বিমলেন্দুবাবুকে বিয়ে করবো।'

'বিমলেন্দু—? বিমল ? তোর সাহেব-কাকা ?' দিদিমা কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসলেন—আমি তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলাম, 'হ্যাঁ, তাঁকেই। তিনিই আমার স্বামী।'

দিদিমার মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। স্তব্ধ হ'য়ে মরা মানুষের মতো ব'সে রইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভ'রে গেলো ঘর। খানিক পরে নিঃশব্দ পায়ে মা ঘরে এসে আলো জ্বাললেন—আমাকে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকতে দেখে অবাক হ'য়ে বললেন, 'এ কী, বুলু! কী হয়েছে ?'

আমি জবাব দিলাম না। দিদিমা বললেন, 'মলিনা, শোনো।' মা কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বিমলের সঙ্গেই বুলুর বিয়ে ঠিক কর। বয়সে একটু বড়ো, তা আর কী! আমার শাশুড়ি আর শ্বশুরও কুড়ি বছরের ছোটো-বড়ো ছিলেন।'

'এ কী বলছো, মা ?'

'ঠিকই বলছি, এর চাইতে ভালো আর তুই কী আশা করিস ?'

'ছি ছি,' মা শিহরিত হ'য়ে উঠলেন, 'ও ওঁর কন্যার মতো - এমন অসংগত কথা তুমি ভাবলে কেমন ক'রে, মা ?'

'কিছুই অসংগত নয় সংসারে। তুই তাকে বলবি এ-কথা।' মা-র মুখে একটি কালো ছায়া বিস্তীর্ণ হ'লো। আমার মাথায় ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বললেন, 'দিদিমা কী বলছেন শুনলে, বুলু ?'

আমি নিঃশব্দে প'ড়ে রইলাম। মা আবার বললেন, 'দিদিমা কী বলছেন—বুলু—'

আমি নিঃশব্দ।

'হুঁ—' মা-র মুখ দিয়ে এ-শব্দটি এমন-একটি মূর্তি নিলো আমার কাছে যে আমার মনে হ'লো সমস্ত ঘরে যেন আগুন লেগেছে, পুড়ে এক্ষুনি ছাই হ'য়ে যাবে।

অত্যন্ত একটা অশান্তি আর অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো সময়। বাড়িময় যেন একটা ভূতের ফিশফিশানি, কেমন-এক অদৃশ্য ভয়ে মুহুর্মুহু আমি কেঁপে উঠতে লাগলাম। রাত্রিতে মা-র সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে সময় কাটতে লাগলো -আমি অনুভব করলাম তিনি ঘুমোননি—তিনিও হয়তো অনুভব করলেন যে আমার চোখ নির্ঘুম। অনেক রাত্রে আমার গায়ের উপর হাত রেখে মা ডাকলেন, 'বুলু, ঘুমিয়েছো ?'

'না।'

'তোমার দিদিমা যা বললেন, তা-ই কি তোমার মত ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি জানো এতদিন ধ'রে এ-সংসারকে তিনি লালন-পালন করেছেন কার জন্য।'

'জানি।'

'কী জানো ?'

'তোমার জন্য।'

'তাহ'লে তুমি জানো যে আমি তাঁর জীবনের প্রধান কেন্দ্র ? আমাকে ঘিরেই তাঁর সুখদুঃখ।'

'জানি।'

'তবে ?'

'আমি তাঁকে ভালোবাসি। তিনি তোমাকে যত ভালোবাসেন তার চাইতে অনেক, অনেক বেশি আমি তাঁকে ভালোবাসি।

অত্যন্ত ধীর স্থির গলায় মা বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস করো না যে তাঁর অতখানি ভালোবাসা আমিও অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি? আর তা সার্থক করবার একমাত্র বাধা ছিলে তুমি? তোমার জন্যই আমি আমার সমস্ত ইচ্ছাকে এতকাল গলা টিপে রেখেছি।'

'বাবার মৃত আত্মাকে তুমি অসম্মান করছো।'

'আমি ম'রে গেলে কি তোমার বাবা আমার আত্মার কথা ভাবতেন?'

'তুমি স্ত্রী, তিনি স্বামী।'

'সে তো সমাজের অনুশাসনের প্রভেদ! আত্মার তো কোনো ভেদাভেদ নেই।' হঠাৎ আমি ভেবে পেলাম না এ-কথার কী জবাব দেবো। একটু পরে মা-ই বললেন, 'তুমি আমার সন্তান। শরীরের বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে তিলে-তিলে আমি তোমাকে লালন করেছি, প্রাণের অধিক ভালোবেসে, সাধ্যের অতিরিক্ত যত্ন দিয়ে তোমাকে বড়ো হ'তে সহায়তা করেছি, সত্যি বলতে, এ-ভদ্রলোকের সাহায্য তোমার কথা ভেবেই প্রথম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আজকের দিনে তুমিই আমার পরম শত্রু। আজ এই অন্ধকারে শুয়ে তোমার সঙ্গে যে-কথা আমাকে বলতে হ'লো সেটা মা-মেয়ের কথা নয়, আমার পক্ষে তার চাইতে লজ্জার, তার চাইতে মর্মান্তিক আর কী থাকতে পারে? কিন্তু তবু তোমাকে বলি, অনেক দিন আগেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, আমি রাজি হইনি কিন্তু কাল আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলুম—'

'মা!'

'বুলু!'

'মা—' কান্নার বেগে আমার সমস্ত শরীর উদ্বেলিত হ'তে লাগলো। একটু পরে মা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন—একটা নিশ্বাস নিতে-নিতে বললেন, 'অদৃষ্টের এ কী বিড়ম্বনা!'

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙেও বিছানায় প'ড়ে ছিলুম। মা কখন উঠে গেছেন জানি না। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছিলো বিছানায়, বুঝলাম বেলা হয়েছে। সহসা ঐ ভদ্রলোকের গলা শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে গেলাম। দ্রুত পায়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন, আমাকে তখনো বিছানায় দেখে অবাক হ'য়ে বললেন, 'ও মা, এখনো ঘুমুচ্ছো? ওঠো, ওঠো, মা কই? শিগগির একবার বসবার ঘরে এসো।'

চোখ তুলতে পারলাম না সংকোচে। ততক্ষণে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে অদৃশ্য হলেন। দেয়ালে ঠেকানো তক্তপোশে হেলান দিয়ে ব'সে রইলাম চুপ ক'রে। হাত-পা যেন কেমন শিথিল হ'য়ে এলো।

খানিক পরে মা এলেন ঘরে। সেই কালো-পাড় শাড়ি, মাথায় আঁচল ঈষৎ তোলা—সরু হার গলায় চিকচিক করছে—সেই রকম শান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী। এতদিনের দেখা মাকে আবার দেখলুম। মাথার কাছের আধো-ভেজানো জানলা খুলে দিয়ে বললেন, 'ওঠো, কত বেলা হ'লো।' একটু থেমে—'কাল বিমলবাবু বলেছিলেন একটি ছেলেকে নিয়ে আসবেন—তিনি এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হ'লো। উঠছিলাম, থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'জানি কেন।'

ক্ষিপ্রহস্তে বিশৃঙ্খল বিছানা পাট করতে-করতে মা জবাব দিলেন, 'সেই কেন আজ আর নেই—তোমার ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টাই আমি করবো। কিন্তু বাড়িতে যখন অতিথি আসেন তাঁর সঙ্গে শোভন ব্যবহারই ভদ্রতা।'

আমি মেনে নিলাম। একটু পরে মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে যথারীতি ভদ্র হ'য়ে এ-ঘরে এলাম।

আমার বয়স এবং বুদ্ধির যোগ্য এ-পাত্র। বিমলবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন—অত্যন্ত লাজুক চোখে একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিলো ছেলেটি।

বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়, ঈষৎ ঢেউ-খেলানো বড়ো-বড়ো ঘন আর বিশৃঙ্খল চুল মুখ ঘিরে আছে। ভালো ক'রে তাকে দেখবার অবকাশ ঘটলো—কেননা সে নিজে নতদৃষ্টি—আর বিমলেন্দুবাবু মাকে ডাকতে গেলেন। খুব যে একটা বলবান পুরুষ তা নয়—কিন্তু স্বাস্থ্যের আভা ভরা মুখ। কালো আর সুসন্নিবিষ্ট ভুরুর তলায় দু'টি ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চোখ। একটু কেশে, একটু লাল হ'য়ে ছেলেটি মুখ তুললো এবার—ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললো, 'আপনি তো স্কটিশেই পড়ছেন, আমিও ঐ কলেজে পড়তুম।'

'ও।'

'খুব ভালো লাগতো, আমাদের একটা আলাদা দলই ছিলো—'

'আমার ভালো লাগে না—' উৎসাহের মুখে পাথর চাপা দিয়ে ব'লে উঠলাম আমি। আমার নিষ্করুণ জবাবে হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলো ছেলেটি। আমি বললাম, 'ভারি খারাপ ছেলে সব। এ-দেশে নাকি এখনো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে শিক্ষার সময় হয়েছে—আমার তো মনে হয় না।' ঈষৎ প্রতিবাদের

গলায় (যদিও খুব স্তিমিত) বললো, 'তা দেখুন—সব মেয়েও তো কিছু ভালো হয় না—ছেলেদের মতো তাঁদের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে।'

'জানি না।'

আমার কথাবার্তা যে অত্যন্ত উদ্ধত ও স্পষ্ট ছিলো সে-বিষয়ে আমি অচেতন ছিলাম না। বিরক্তির বাষ্পে ওকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে আমার ভালো লাগছিলো। ও যে এসেছে আর সে-আসা যে ওর পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হয়েছে সে-কথা ওকে জানানো ভালো। আমার জবাবের পর একটুখানি থেমে রইলো ওর জিহ্বা, আমি উঠে যাবার জন্য মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, সহসা মুখ তুলে বললো, 'আজ কখন যাবেন ?'

'যাবো ! কোথায় ?'

'কেন, বিমল-দা যে বললেন—'

'কী বলেছেন বিমলবাবু ?'

'আমাকে তো ধ'রে নিয়ে এলেন—'

ওর কথার মধ্যিখানেই মা আর বিমলবাবু ঘরে ঢুকলেন। ও থেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মৃদুহাস্যে মা বললেন, 'উঠছো কেন ? বোসো। বুলু, যাও তো, চা নিয়ে এসো। আমি সব ঠিক ক'রে রেখে এসেছি।'

মা-র এই আদেশ আমি মনে-মনে অপছন্দ করলুম। চাকর দিয়েও অনায়াসে এটা চলতো। তবু উঠতে হ'লো।

চায়ের পর্বটি কিছু বিরাট ছিলো না, তবু অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি। নিজে হাতে ক'রেই সব নিয়ে এলাম। বিমলবাবু সাহায্য করলেন। আমাকেও বসতে হ'লো ওদের সঙ্গে চা খেতে। এতক্ষণে দেখলুম ছেলেটি সহজ হয়েছে, অত্যন্ত আগ্রহভরে কথা বলছে মা-র সঙ্গে। অবশেষে সেই অর্ধসমাপ্ত প্রসঙ্গ ফিরে এলো।

'কখন যাবেন, বিমল-দা ?'

আমি একচোখ প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম বিমলবাবুর দিকে। মা-র মুখ দেখে মনে হ'লো এই যাওয়ার খবরটা মা জানেন।

বিমলবাবু হাতঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, 'বাবা ! এর মধ্যেই সাড়ে-আটটা ! এক কাজ করো, অসিত, তুমি আর আজ যেয়ো না, এখানেই যা-হয় দুটো খেয়ে নাও—আমি এদিকে বারোটার মধ্যে কাজকর্ম সেরে চ'লে আসি, তারপরে—'

মা ব'লে উঠলেন, 'সেটাই সবচেয়ে ভালো।'

'না, না,' অপাঙ্গে একবার আমাকে দেখে নিয়ে অসিত ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'আপনারা কখন যাবেন বলুন, আমি ঠিক সেই সময়ে আসবো।'

'কোথায় যাবে, মা?' আমি আর কৌতূহল রাখতে পারলাম না।

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সাহেব-কাকা আজ বোটানিকেল গার্ডেনে যাচ্ছেন তোমাদের নিয়ে।' মুখ থেকে কথা শেষ না-হ'তেই বিমলবাবু ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, 'তুমি বুঝি বাদ?'

সাহেব-কাকা ব'লেই মা আমার মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়েছিলেন। কালকের ঐ ব্যাপারের পরেও মা যে কী ক'রে তাঁকে আমার কাকা ব'লে উচ্চারণ করলেন জানি না —উপরন্তু মা যাবেন না ব'লে বিমলবাবুর এই ব্যাকুলতা আমাকে চাবুক মারলো। দুর্বিনীতের মতো উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে—আলস্য ভাঙতে-ভাঙতে অবহেলার ভঙ্গিতে বললাম, 'তোমরাই যাও, মা—আমি যাবো না।'

'কেন?' বিমলবাবু বললেন, 'তোমার জন্যেই তো যাওয়া—তুমি না-গেলে নাকি হয়?'

'আমার জন্যে কিনা জানি না—তবে হ'লেও আমি যাবো না, এটা ঠিক।'

'তোমার আবার কী হ'লো?'

'এর মধ্যে একটা হওয়া-না-হওয়ার কী দেখছেন, বিমলবাবু?' আমার বিমলবাবু সম্বোধনে উনি অবাক হ'য়ে গেলেন—মা-র মুখ, রাগে কি লজ্জায় জানি না, মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠলো। আমি গ্রাহ্য না-ক'রে অতিরিক্ত সহজভাবে তাকালাম সেই আগন্তুক আর অপ্রস্তুত ছেলেটির মুখে—সহাস্যে বললাম, 'আচ্ছা নমস্কার, আশা করি আবার দেখা হবে।' প্রত্যভিবাদনের আর অপেক্ষা না-ক'রে তিনটি প্রাণীকে বিমূঢ় ক'রে দিয়ে সোজা চ'লে এলাম নিজের নির্জন ঘরে।

তারপরে সমস্ত ব্যাপারটা মা অবশ্যই কোনোরকমে তাঁর নিজের ভদ্রতা আর নম্রতা দিয়ে মানিয়ে নিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমার যখন মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো, মা তখন ঘরে এলেন। সোজা তিনি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'সমস্ত জীবনটা যে আমি তোমার জন্যই উৎসর্গ ক'রে রেখেছিলাম, তুমি কি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছো, বুলু?'

ভীরু চোখ চকিতে তুললাম। জবাব দিলাম না।

'বলো, জবাব দাও—আমার চোখের সামনে আমার হাতে গড়া সন্তান

এত বড়ো উদ্ধত আচরণ করবে, অহেতুক অসম্মান করবে শ্রদ্ধেয়দের, আর আমি চুপ ক'রে তা দেখবো ? বুলু, তুমি ভেবেছো কী ?'

কথা বলতে-বলতে মা-র নিশ্বাসের উত্থান-পতন দ্রুত হ'লো। ছেলেবেলা থেকে মা আমাকে স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে, বন্ধুতার উত্তাপ দিয়ে বড়ো করেছেন—শাসন করেছেন তার ফাঁকে-ফাঁকে—আমি জানতে পারিনি। তাঁর সঙ্গ, তাঁর স্পর্শ, তাঁর স্বভাবের মাধুরী আমার সারা হৃদয়ের সকল অভাব মিটিয়ে রেখেছিলো, আর আজ দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখলাম, তাঁর চাইতে বড়ো শত্রু আমার কেউ না। হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম—তীব্রকণ্ঠে মা ব'লে উঠলেন, 'আমারই অন্যায়, আমারই প্রশ্রয়ে আজ তোমার এতখানি দুঃসাহস। যিনি তোমার পিতৃতুল্য তাঁকে তুমি ভালোবাসো—যে-মুহূর্তে তুমি এ-কথা উচ্চারণ করেছিলে সে-মুহূর্তেই—'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো—মুখে-মুখে ব'লে উঠলাম 'কেন, কিসের জন্য ? কেন তুমি তাঁকে আমার কাকা ব'লে সম্বোধন করলে একটু আগে ?'

'তুমি তাঁকে যা-ই ভাবো তিনি তোমার পক্ষে তাছাড়া অন্য-কিছু হ'তে পারেন না।' অসভ্যের মতো বললাম, 'স্বামীর বন্ধু হ'য়ে তিনি তোমার পক্ষে অন্য হ'তে পারলে আমার পক্ষেও হ'তে পারেন।'

'বুলু, আমি তোমার মা !' সহসা মা-র গলা যেন কান্নার আবেগে বুজে এলো। আমি নিবৃত্ত হ'তে পারলাম না—অনেকদিনের অনেক ক্লেদাক্ত ঈর্ষা মনের মধ্যে লালন করেছি এতদিন ধ'রে, আজ তা কথার রেখায় মূর্তি নিলো। যাঁকে বুকের মধ্যে পাবার জন্য অবিরত ইচ্ছার তীব্র আবেগে আমি ম'রে যাচ্ছি, যাঁকে না-পেলে সমস্ত জীবন আমার গভীর অন্ধকারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে,—তাঁকে যে-মেয়ে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে, যে-মেয়ের জন্য তিনি আজ অন্যদিকে মুখ ফেরাতে পারেন না, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, মা হ'লেও না। চোখে চোখে তাকিয়ে বললাম—'তিনিও অবিবাহিত, আমিও কারো স্ত্রী নই—তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য আমার সমস্ত জীবন আজ ব্যর্থ হ'তে বসেছে—তুমিই আমাদের জীবনকে মুক্ত করবার একমাত্র প্রতিবন্ধক।'

'কী হয়েছে ?'—ঘরের মধ্যে সহসা বিমলবাবু ঢুকলেন এসে। 'বুলুর আজ হ'লো কী ? মেজাজ এত বিগড়েছে কেন ?'

আমার কথা শুনে মা-র চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়লো, আর তাঁকে দেখে আমি চুপ করলাম।

'হ'লো কী তোমাদের?' আশ্চর্য হ'য়ে তিনি একবার মা-র দিকে, একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর আমার একান্ত কাছে এসে তাঁর সেই বলিষ্ঠ স্নেহভরা বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে বলো তো, বুলু। লক্ষ্মী মা আমার।'

ছিটকে স'রে এলাম বুকের সান্নিধ্য থেকে। ক্রন্দন-বিজড়িত গলায় বললাম, 'আপনি আমাকে মা বলেন কেন?'

অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে থমকে গেলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ আমি দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর বুকের উপর; দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে কেঁদে-কেঁদে মুখ ঘ'সে-ঘ'সে বলতে লাগলাম, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি – মা-র চাইতে বেশি, অনেক, অনেক বেশি।'

আমার এই অতর্কিত আবেগের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না—আমার এ-রকম অসংলগ্ন কথাবার্তাও অবশ্যই তাঁকে বিরক্ত ও বিস্মিত ক'রে থাকবে—আমাকে ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'শান্ত হও, কী হয়েছে খুলে বলো।' তাঁর গলার গম্ভীর স্বরে হঠাৎ আমি ভয় পেলুম।

তাঁর স্বভাবত ধীর কণ্ঠ আরো ধীর হ'লো, পিতৃত্বের গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মুখে, মা-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যাও, অসিতকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

মা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন—ভাবে মনে হ'লো না কোনো কথাই তাঁর কানে ঢুকেছে। বিমলবাবু মুখের দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বিগ্ন হ'লেন। আবার বললেন, 'আমি বুলুর সঙ্গে কথা বলবো—তুমি অসিতের কাছে গিয়ে বোসো।'

মা আস্তে ব'সে পড়লেন মেঝের উপর।

'কী হোলো, মণি, কী হোলো', উদ্‌ভ্রান্ত গলায় ব'লে উঠলেন বিমলবাবু, 'বুলু, শিগগির জল নিয়ে এসো।'

চেঁচামেচিতে বাড়ির সব ক'টি প্রাণীই জড়ো হ'লো সেই ঘরে—দেখলুম, অসিতও এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়। কেবল অসহায় দিদিমা ও-ঘর থেকে কাৎরাতে লাগলেন। ব্যাকুল হ'য়ে বিমলবাবু বললেন, 'এই অসিত, তুমি শিগগির ডক্টর মুখার্জিকে নিয়েসো—একটুও দেরি না—' তারপর মা-র মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মণি, মণি,—শোনো, এই

শুনছো?' তাঁর গলার সুরে কী ছিলো সে-কথা আমি কেমন ক'রে বোঝাবো? হয়তো ভালোবাসার অতলস্পর্শী সম্মোহন ছিলো তাঁর কণ্ঠে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

বিশেষ-কিছু না—একটুখানি সময়ের জন্য হয়তো মা-র চৈতন্য লুপ্ত হয়েছিলো, খানিক পরেই তিনি চোখ খুললেন। ডান হাতটি একটু নেড়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'বুলু, আয়।'

মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে মা-র কপালে হাত রাখলাম—তাঁর সুন্দর মুখে দুঃখবেদনার লীলা। একটু আগে যে-মা আমার পরম শত্রু ছিলেন, যাঁর অস্তিত্বই ছিলো আমার জীবনের চরম সুখের পক্ষে সর্বপ্রধান অন্তরায়, সেই মা-র এইটুকু অচৈতন্যের ব্যবধানই আমাকে তাঁর অনেক কাছে এনে ফেললো। মা আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুগভীর লজ্জায় দু' হাতে মুখ ঢেকে নিতান্ত অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন।

অসিত ফিরে এলো ডাক্তার নিয়ে। তার মুখেও উদ্বেগের ছায়া। ফিশফিশিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছিলো?' আমি বললাম, 'এই একটু অজ্ঞান মতো—'

'এ-রকম আরো হয় নাকি?'

'না।'

আমার সংক্ষিপ্ত জবাবে আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে সে ভরসা পেলো না, বোধহয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মা স্বাভাবিক হ'য়ে উঠলেন। বিমলবাবু নিজেও গেলেন না—অসিতকেও ধ'রে রাখলেন সে-বেলার জন্য। আবহাওয়াটা সহজ করবার জন্য হাসিমুখে বললেন, 'আমার এত সাধের রবিবারটাই মাটি করলে তোমরা। কোথায় ভেবেছিলাম বোটানিকেলে গিয়ে গাছের ছায়ায়-ছায়ায় চমৎকার ঘুরে বেড়াবো—চারটা না-বাজতেই মাঠে ব'সে চর্ব্যচোষ্য সহযোগে চা পান—কী কাণ্ডই হ'লো বলো তো? কী আর করবে, অসিত, তোমারই ভাগ্য। বুলু, অসিতকে ভালো ক'রে বলো—ও কিছুতেই থাকতে চাইছে না। আমিই জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলাম—'

'আমি যাই, বিমল-দা, আমার আজ—'

মা বললেন, 'বোসো।' তাঁর উচ্চারণের ভঙ্গিতে অপরিমিত স্নেহ ও আদেশ ছিলো। তিনি যেন মা আর অসিত তাঁর ছেলে। অসিত বাধ্য

ছেলের মতো বসলো, আর কথা বললো না। আমি উঠে গেলাম সেখান থেকে। বিমলবাবু গুরুজনের মতো বললেন, 'যাও, মা-র খাবার ঠিক করো গে।'

এ-বেলা বিমলবাবু মা-কে উঠতে দিলেন না। কিন্তু বিকেলে আবার তিনি ওঠা-হাঁটা করতে লাগলেন, কাজকর্ম করলেন, আর সুস্থ মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার সেই লজ্জা আর বিরোধ ফিরে এলো আমার হৃদয়ের মধ্যে। দু'দিন আমি প্রায় নিজেকে লুকিয়েই রাখলুম তাঁর কাছ থেকে। বিমলবাবু যথারীতি এলেন, অসিতও পরের দিন খবর নিতে এলো— আমার সঙ্গে দেখা হ'লো না কারুরই। আত্মগোপন করা ছাড়া আর আমার কী উপায় ছিলো?

মুশকিল হ'তো রাত্তিরে। নিঃশব্দে মা-র পাশে গিয়ে শুতুম, কিন্তু গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়েও যে কত বড়ো ব্যবধান থাকতে পারে দু'জন প্রাণীর মধ্যে আমরা মা-মেয়ে তা প্রতি পলে অনুভব করতুম। বলি-বলি ক'রে মা-ও কথা বলতে পারতেন না, আমিও পারতাম না। দুর্লঙ্ঘ্য এক দেয়াল উঠলো দু'জনের মধ্যে।

তৃতীয় দিন ভোর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো—জেগে দেখলুম, গুনগুনিয়ে মা কাঁদছেন। মা কাঁদছেন! আমি তো তাঁকে কাঁদতে দেখিনি কোনোদিন। বুকটা ধড়াশ ক'রে উঠলো—অন্ধকারে হাত বাড়ালাম তাঁর দিকে—ডাকলাম, 'মা।' মুহূর্তে মা-র গুনগুনানি বন্ধ হ'য়ে গেলো—একটা কাতরোক্তি ক'রে তিনি পাশ ফিরলেন। উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'একটু জল দাও।'

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। তীব্র উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললাম, জল দিলাম—তারপর দৌড়ে গিয়ে ভৃত্যের ঘুম ভাঙিয়ে বিমলবাবুকে ডাকতে পাঠালাম। হয়তো তখনো ট্র্যাম চলতে শুরু করেনি, হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তবু সেই অন্ধকারেই আমি তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে মা-র কাছে ফিরে এসে বসলাম, একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার ভারে বুক যেন বোঝাই হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে। সূর্য ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিমলবাবুকে নিয়ে ভৃত্য ফিরে এলো। লাল দুই চোখ মেলে মা তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

কপালের উপর হাত রেখে উনি ভুরু কুঁচকোলেন। দু'বার মাথায়

হাত বুলিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'তুমি কাছে থাকো, বুলু, ডাক্তার নিয়ে আসি।'

ডাক্তার এসেছিলো। তার চাইতে বড়ো ডাক্তারও এসেছিলো ছ'দিন পরে—আর তারও পাঁচদিন পরে কলকাতা শহরের সমস্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের দিকে মুখ ফিরিয়ে মা সমস্ত সুখদুঃখের অতীত হলেন। মৃতোন্মুখ দিদিমার বুক-ফাটা আর্তনাদে সমস্ত পৃথিবী ভ'রে গেলো। শুষ্ক চোখে ব'সে-ব'সে দেখলুম, বিমলবাবু নিজ হাতে সাজিয়ে দিচ্ছেন মা-কে। বহুমূল্য বেনারসিতে শোভিত করলেন তাঁর মৃতদেহ, ফুলের গহনা দিয়ে মুড়ে দিলেন আপাদমস্তক—তারপর রাশি-রাশি সিঁদুরে শোভিত করলেন তাঁর ললাট আর মাথা। তাঁর এই পাগলামি দেখে কে কী ভেবেছিলো জানি না—আমি নিজেও যে কী ভেবেছিলাম তাও জানি না—বুকের মধ্যে একটা চাপা আর দম-আটকানো গুমরানি অনুভব করলাম অত্যন্ত তীব্রভাবে—আস্তে এগিয়ে গিয়ে মা-র নরম বুকের উপর মাথা রাখলাম, ধীরে-ধীরে আমার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

তবু দিন কাটলো। একটা দণ্ড যার অস্তিত্ব না-থাকলে এই ছোটো সংসার আবর্তিত হ'য়ে উঠতো—সেই মানুষের অভাবেও এ-বাড়িতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত তাদের আলো-ছায়া ফেললো—কয়েকদিন পরে বিমলবাবুও আবার আপিশে যেতে লাগলেন—আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে মোড়া দিদিমাও মুখের ঢাকা খুললেন—আমি আবার প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়ালাম, সকল কর্তব্যই সকলে ন'ড়ে-চ'ড়ে করতে লাগলাম, কেবল প্রাণশক্তির চাবিকাঠিটি নিয়ে মা আর ফিরে এলেন না এই সংসারে।

মা-র অসুখ থেকে শুরু ক'রে আমাদের এই অবর্ণনীয় দিনের দুঃখময় জীবনের সঙ্গে অসিতও এ-ক'দিন জড়িত ছিলো। প্রথমটায় বিমলবাবু অত্যন্ত বেশিরকম উদ্‌ভ্রান্তই হ'য়ে পড়েছিলেন। বলতে গেলে এ-বাড়ির সব ক'টি প্রাণীই আমরা এমন একটা অবস্থায় ছিলাম যে অসিত না থাকলে হয়তো কিছুতেই চলতো না। বিধাতার আশীর্বাদের মতোই সকলের সেবার ভার নিয়ে সে মুখ গুঁজে প'ড়ে ছিলো এখানে। কিন্তু বিদায় নেবার সময় হ'লো তার।

মাস দু'য়েক পরে কোনো-একদিন চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম ঘরে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ঘর ভ'রে গিয়েছিলো। দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে চঞ্চল হ'য়ে উঠলাম। বুঝলাম বিমলবাবু এসেছেন। মৃদু গলায় উনি আমার নাম ধ'রে ডাকতেই আমি তাঁকে আসতে ব'লে উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দিলাম ঘরের। চায়ের জোগাড়ে যাচ্ছিলাম, উনি বললেন, 'এখনো শুয়ে ছিলে ?'

'এমনি'।

'এ-বাড়ি আর ভালো লাগে না. না ?' বলতে গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। আমি মুখ নিচু করলাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'বোসো। আমি এখন চা খাবো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সে কী কথা তা আমি বুঝলাম। ক'দিন থেকেই উনি যেন কী বলতে চান আমাকে। বারংবার বলবার জন্য মুখ খুলেও থেমে যান। কিন্তু অসুখী বোধ করলেও প্রস্তুত হ'য়ে বললাম, 'বলুন।'

একটুও ভূমিকা করলেন না তিনি। তিনিও সেদিন প্রস্তুত ছিলেন হয়তো। ধীর গম্ভীর গলায় স্বভাবোচিত নিচু স্বরে বললেন, 'অসিতকে কী বলবো ?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'তোমার মত না নিয়ে তো হ'তে পারে না।'

তাঁর চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললাম, 'কী হ'তে পারে না ?'

একটু পলক নড়লো না তাঁর, কেবল কেমন-একটা কঠিনতা ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে—বললেন, 'বিয়ে।'

'বিয়ে !'

'হ্যাঁ, বুলু—তোমার বিয়ের কথাই বলছি আমি। তোমার কোনো ব্যবস্থা করতে না-পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি একটু শান্তি চাই।'

কথা শুনে আহত হ'লাম। নিজেকে সংযত রেখে যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'আপনাকে তো সবই বলেছি। সবই তো জানেন।'

'জানি।'

'তবে ?'

'সে তোমার ভুল, বুলু, সে তোমার শিশু-মনের একটা খেলা।'

'জানি না খেলা কিনা—আমাকে অবকাশ দিন ভুল ভাঙবার।'

'শোনো—' তাঁর গলার স্বরে অদ্ভুত কান্নার শব্দ পেলাম। চকিত হ'য়ে চোখ তুলতেই তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, 'তুমি তো জানো তোমার মা ছাড়া এ-পৃথিবীতে আমার কাছে এমন-কোনো মেয়ে ছিলো না, যার প্রতি ক্ষণিকের জন্যও আমার মন বিভ্রান্ত হ'তে পারে। ও যে আমার কী ছিলো—ও যে আমাকে কতখানি ভ'রে দিয়েছিলো শুধু ওর অস্তিত্ব দিয়ে, তা আমি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাবো। তোমাকে এইটুকু থেকে ভালোবেসে বড়ো করেছি, আমার স্নেহে এতটুকু খাদ ছিলো না—তোমার প্রতি আমার অপরিসীম আকর্ষণ—অপরিসীম মমতা—সুমন্ত্র বেঁচে থাকলে আমার চাইতে বেশি ভালোবাসতে পারতো কিনা জানি না—সেই তুমি—'

আমি দু' হাতে মুখ ঢেকে বললাম, 'জানি, জানি—'

'শান্ত হও, শোনো—তোমার মৃত মায়ের আত্মার কথা চিন্তা করো—'

কান্নাভরা গলায় বললাম, 'তিনি তো আপনাকে লিখে গেছেন, আমার সুখই তাঁর সুখ,—তাঁর কোনো আলাদা সুখ নেই।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি, ব্যথিত গলায় বললেন 'এই তোমার শেষ কথা?' 'এই শেষ— বিমলবাবু, এই শেষ।' আমি নিচু হ'য়ে তাঁর পায়ে মাথা রাখলাম। একটু ব'সে রইলেন চুপ ক'রে—একটু হাত বুলোলেন মাথায়—তারপর নিঃশব্দে উঠে গেলেন সেখান থেকে। আমি সেই পরিত্যক্ত জায়গায় মাথা কুটে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগলাম।

অসিত এলো ঘণ্টাখানেক পরে। ভৃত্য এসে খবর দিতেই সংযত হ'য়ে উঠে বসলাম। আমার মুখ-চোখ দেখে ও যেন আঘাত পেলো। একটু তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। চোখের এ-দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়। বুকটা কেঁপে উঠলো। বললাম, 'বসুন।'

'আপনি আজ বড্ড বিচলিত রয়েছেন।'

'না।'

'কিন্তু কী করবেন—'

চুপ ক'রে রইলাম। একটু দ্বিধা ক'রে বললো, 'আমার তো চ'লে যাবার সময় হ'লো—ছুটির দুটো মাস কাটিয়ে দিলাম—'

'আপনি যাবেন?'

'হ্যাঁ, মা বার-বার চিঠি লিখছেন—'

'ও।'

'আমার তো যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু—'

'না, যাবেন না কেন—মা আশা ক'রে আছেন!'

অসিত আমার কাছে থেকে যাবার উৎসাহ প্রার্থনা করেনি—কী প্রার্থনা করেছিলো তা আমি জানি। ব্যথিত হ'লাম, কিন্তু উপায় নেই।

একটু চুপচাপ কাটলো। তারপর মৃদু স্বরে বললো, 'আমাকে কি আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই?'

নিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'আপনার জন্য আমার কত কৃতজ্ঞতা জমা হ'য়ে আছে মনের মধ্যে—'

বাধা দিয়ে অস্থির গলায় বললো, 'কৃতজ্ঞতার কথা কেন তুলছেন—আমি তার কথা বলছি না—আপনি কি বোঝেননি আমার কথা?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম, তারপর পরিষ্কার গলায় বললাম, 'বুঝেছি, কিন্তু সে হ'তে পারে না, অসিতবাবু—কিছুতেই না।'

'কিছুতেই না?'

'না।'

খানিকক্ষণ স্থানুর মতো ব'সে রইলো অসিত—তারপর ঠিক বিমলবাবুর মতো ক'রেই ধীরে-ধীরে উঠে গেলো ঘর ছেড়ে। আবার আমার দু'চোখ ছাপিয়ে জল এলো—বুক ভেসে গেলো উদ্বেলিত অশ্রুর প্লাবনে।

পরের দিন সকালবেলা কিছু আগে পরে দু'খানা চিঠি পেলাম ভৃত্যের মারফৎ—

'বুলু,

তোমার সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখে গেলাম—আশা করি কোনো আর্থিক কষ্ট তোমাকে পেতে হবে না।

যেখানেই থাকি আমার অন্তরের সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সততই তোমাকে ঘিরে থাকবে।

হতভাগ্য বিমলেন্দু।'

'সুচরিতাসু,

(প্যাণ্ডোরার অদম্য কৌতূহলের দোষেই সমস্ত পৃথিবীতে দুঃখ ছড়িয়ে পড়েছিলো—কিন্তু আশার কৌটোটি সে খুলতে পারেনি—তাই সে-আশা যতই দুরাশা হোক, মানুষ তাকে চিরকাল ধ'রে লালন করে আপন বুকের মধ্যে—আমিও সেই আশাটি মনের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখলাম—যদি কখনো সময় আসে আপনি নিশ্চয়ই ডাক দেবেন আমাকে।)

হতভাগ্য অসিত।'

দু'খানা চিঠি হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম খানিকক্ষণ। মনের মধ্যে ভ্রমরের একঘেয়ে গুনগুনানির মতো একটি কথাই কেবল গুঞ্জিত হ'তে লাগলো : গেলো—সব গেলো।

অন্তহীন

হৃদয়টা মানুষের এক অজ্ঞাত রহস্য। যত বড়ো পণ্ডিতই তুমি হও না কেন, এখানে এসে তার চেয়েও বড়ো কোনো শক্তির কাছে তোমাকে নিচু হ'তেই হবে। এই সুদীর্ঘ আটতিরিশ বছর বয়সেও সুশান্তর মন আবার পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরপুর হ'য়ে উঠলো। অনেক আকাঙ্ক্ষা আর অনেক দুঃখের অলিগলি পেরিয়ে এই এতদিনে একটু নিশ্বাস নিয়ে বসেছিলো মাত্র, এর মধ্যেই হুড়মুড় ক'রে এলো আবার ঝড়। প্রথম ঝাপটাটা সে তার এতদিনকার অর্জিত স্থৈর্য দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলো বটে, কিন্তু যেখানে এত সুখ, আনন্দ, ভবিষ্যৎ দুঃখের এত বড়ো তীব্রতার আভাস, সেখানে কি মানুষ স্থির থাকতে পারে? নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সে নিশ্চিন্ত হ'লো। মনে-মনে ভাবলো, 'যা হয় হোক, আর পারি না।'

জীবনের আরম্ভটা মন্দ ছিলো না। বিধবা পিসির অপর্যাপ্ত শাসন আর পিতার প্রচুর আদর দুটো মিলে তার জীবনে একটা ভাবসাম্য স্থাপন করেছিলো। মা বেচারা স্বামী আর ননদের ছায়া হ'য়েই দিন কাটাচ্ছিলেন, কাজেই পুত্রের প্রতি তাঁর কোনো ভাবই প্রকট ছিলো না। অল্প বয়সের প্রথম সন্তান—বরং কেমন একটা লজ্জা-লজ্জা ভাবই ছিলো যেন। চোদ্দ বছরের ছোটো-বড়ো—অনায়াসেই তারা ভাইবোন হ'তে পারতো। কিছুকাল পর্যন্ত এ-সংসারের সে-ই একমাত্র শিশু ছিলো—একাদিক্রমে পাঁচ বছর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবার পরে এলো একটি ফুটফুটে ছোটো বোন। সুশান্তর হৃদয় যেন ভ'রে গেলো—তার পরিপুষ্ট লাবণ্য-ভরা ছোটো বুকের মধ্যে তার চেয়েও অনেক ছোটো একটি প্রাণীর পাখির মতো উষ্ণ আর নরম স্পর্শ তাকে শিহরিত করলো। তার মুখচুম্বন ক'রে এইটুকু-টুকু শাদা মোমের মতো মসৃণ হাতে-পায়ে গাল ঘ'ষে-ঘ'ষে জীবনের চরম আনন্দের আস্বাদ পেলো সে। এত ভালো লাগা যে পৃথিবীতে আছে তা কে জানতো? তার পরের বছর আরো একটি—দু'বছর পরে আরো একটি—এমনি ক'রে-ক'রে পনেরো বছরে পাঁচটি ভাইবোনের দাদা হ'লো সে। ততদিনে সে কুড়ি বছরের যুবক। তার কালো-কালো টানা চোখে মায়া

পৃথিবীর স্বপ্ন। মফস্বলের গণ্ডি ছেড়ে সে কলকাতা এসেছে, ছেলেবেলাকার শাসনকণ্টকিত ছাঁটা চুল এখন কুঞ্চিত হ'য়ে এসে নেমেছে কপালে—মোটা জিন কোটের পরিবর্তে বাঁকা-গলা পাৎলা পাঞ্জাবির তলা দিয়ে তার সুন্দর লাবণ্য-ভরা বুকের আভাস পাওয়া যায়। কলেজের সহপাঠিনীদের দিকে তাকাবার অদম্য ইচ্ছাকে পর্যন্ত সে অনেকটা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে।

কলকাতায় পড়তে আসার এইটেই ছিলো পিসিমার সব চাইতে বড়ো আতঙ্ক। এত কষ্টে ভাইপোকে তিনি ঐ ফ্রক-পরা-পরা পাকা মেয়েগুলোর সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন না ঐ শাড়ি-পরা ছুঁড়িগুলো বিগড়ে দেয়। নরেনবাবু বললেন, 'তোমার যত—শান্ত আমার তেমন ছেলে নাকি?' আসলে শান্ত কিন্তু তেমনি ছেলে। মেয়েদের প্রতি ওর একটা সহজাত আকর্ষণ। পড়তে-পড়তে ও অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়—বড়ো-বড়ো ঘন চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে কী যে মনে পড়ে, কাকে সে আকাঙ্ক্ষা করে বুঝে উঠতে পারে-না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে চুপ ক'রে—ঝিরিঝিরি হাওয়া দিক কি অসম্ভব গুমোট হোক—সবটাই ওর কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে। মনে হয় এমন তো আর হয়নি, আর তো এমন হবে না। হঠাৎ যেন মন কেমন করতে থাকে—মাথা নিচু ক'রে অচেতনভাবেই বইয়ের পাতার উপব পেন্সিল দিয়ে সুন্দর-সুন্দর মুখ আঁকে, তারপর সেই মুখের উপর নিজের মুখ রেখে চোখ বোজে। সেই ছোটোবেলায় পাঁচ বছর বয়সের সময় বোনকে কোলে নেবার রোমাঞ্চের পুনরাবৃত্তি হয় তার [illegible]র মধ্যে।

কিন্তু সত্যি বলতে জীবন্ত শরীরের প্রতি তেমন আকর্ষণ ওর নেই বরং বেশ খানিকটা উদাসীনতা আছে। নিজের মধ্যেই ও সম্পূর্ণ। কেমন একটা উন্মনা আর ঝিমুনো-ঝিমুনো ভাব—অতিরিক্ত নম্র আর পাঁচজন থেকে আপনাকে আলাদা রাখার সহজ ক্ষমতা। এজন্যেই কিনা জানি না, না কি ওর সেই আশ্চর্য লাবণ্য-ভরা বুকের আভাস আর দুই চোখের বিভোরতাই অন্যদের ক্রমাগত ওর প্রতি আকৃষ্ট করে। চোখের তারায় অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যও হয়তো এজন্য দায়ী। পুরুষের পায়ের পাতা আলোচনার যোগ্য নয়, কিন্তু ওর পঞ্চাশ ইঞ্চি লোটানো কোঁচার তলা দিয়ে স্যাণ্ডল-পরা দুটি পায়ের যে-কোনো অংশই মেয়েদের চোখে পড়ুক না কেন, স্বতই সে-চোখ সেখানে [illegible]রুদ্ধ হ'য়ে থাকতো। কী জানি কেন, সে-পায়ে একটু হাত [illegible]বার ইচ্ছেও [illegible] তাদের। বি. এ. পড়বার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে তার সামান্য প্রণয়-

সম্ভাবনা হয়েছিলো, এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আর-একবার হ'লো। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র যে, প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হ'তে-হ'তে এখানে এসেছে, শোনা গেলো ললিতকলাতেও তার অসামান্য দখল। মেয়েদের মধ্যে ফিশফিশানি উঠলো এবং একটি ছবি আঁকার সূত্র ধ'রেই একটি মেয়ে অত্যন্ত কাছে এসেছিলো তার। আর এই কাছে আসাই শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় দাঁড়ালো যে সেটা সুশান্তর পক্ষে সত্যি বিস্ময়ের হয়েছিলো। স্ত্রী-পুরুষে মেলামেশার এই চরম পরিণতি সম্বন্ধে সে সচেতন ছিলো না, তার পক্ষে প্রার্থনার ছিলো শুধু সঙ্গ-মাধুর্য, দৈহিক সংস্পর্শ নয়। কিন্তু কোনো-একদিন মেয়েটি মুখ ভার ক'রে ছলোছলো চোখে বললো, 'এ-রকম করে আর ক'দিন চলবে? কেবল দূরে থাকা, কেবল—'

আশ্চর্য হ'য়ে সুশান্ত জবাব দিলো, 'দূরে থাকা মানে?'

'এ অসম্ভব।'

বুঝলো সুশান্ত। বললো, 'তুমি কী চাও।'

'কী চাই, সে কি মুখ ফুটে বলতে হবে? সে চাওয়া কি তোমারও না?'

'আমি তো আর কিছু চাইনে। প্রতিদিন তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ভালো লাগছে তোমাকে—তোমার সঙ্গে আমার একান্তই—'

'চুপ করো! চুপ করো!' তীব্রতায় মেয়েটির গলা রুক্ষ শোনালো। চুপ ক'রে রইলো সুশান্ত। দুর্নিবার অভিমানে মেয়েটির নিশ্বাস দ্রুত হ'লো—রাগ আর হতাশা মিলিয়ে জল দেখা দিলো তার চোখে। সুশান্ত মৃদুকণ্ঠে বললো, 'রাগ করলে?'

অস্ফুট গলায় জবাব এলো, 'অপদার্থ!'

'আমি তো বুঝতে পারিনে যে—'

মেয়েটি অক্ষম রাগে হাত তুলে বাধা দিলো তাকে। তার ইচ্ছা করলো ঠাশ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দেয় গালে। আশ্চর্য—! এমন নিরুত্তাপ পুরুষমানুষ দিয়ে সে করবে কী? কতদিনের কত সুযোগ ও নষ্ট করেছে, কতদিনের কত প্রার্থনা ও ব্যর্থ করেছে—ও কি মানুষ? হঠাৎ মেয়েটি স্পষ্ট ভাষায় বললো, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কি আমাকে নিয়ে খেলা পেয়েছো?'

এতটুকু হ'য়ে গেলো সুশান্তর মুখ। বিয়ে? বিয়ে করবে কেন? আর খেলাই বা কী করলো! বন্ধুতা কি অন্যায়?

বলাই বাহুল্য, তারপর ছাড়াছাড়ি হ'তে ওদের আর সময় লাগেনি।

কয়েকদিন সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিলো সুশান্তর। রাত্রিতে কতদিন ঘুম ভেঙে ওর মনে পড়েছে মেয়েটিকে, তারপর একদিন মুছে গেছে মন থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে।

আসলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বন্ধুতাটাও ওর বন্ধুতার পর্যায়েই আবদ্ধ থাকতো। অন্যের চোখে এটা স্বাভাবিক ছিলো না, কিন্তু দৈহিক সংস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা ওর শূন্য ছিলো—কেন কে জানে। এ-রকম একটা অস্তিত্বহীন প্রণয় নাকি সম্ভব? ক্রমে-ক্রমে মেয়েরা ওকে দুর্নাম দিতে লাগলো। এটা যে তার একটা খেলা, একাধিক মেয়ে ভোগ করবার অপূর্ব কৌশল এবং এর নামই যে দুশ্চরিত্রতা এ-বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রইলো না। এমনিতেই নানা দিক থেকে সে একটা আলোচনার পাত্র ছিলো—কুড়ি বছরের ছেলের পক্ষে অত পরিণত চেহারা বা বুদ্ধি, সংসারের পক্ষে অমন উদাস বা অদ্ভুত, পণ্ডিতের মতো হাবভাব—সমবয়সীদের মধ্যে কিছুটা ভক্তি, কিছুটা ঈর্ষা, কিছুটা হাসিহাসি—সব মিলিয়ে সে যেন একটা বিচিত্র বিস্ময়। প্রোফেসররাও তাকে যেন খানিকটা সমীহ করতেন। কিন্তু এই মেয়ে-ঠকানো ব্যাপারটায় সবাই একটু আরাম পেলো। তাকে খানিকটা নামাতে পেরে শান্তি পেলো মনে। একটা মানুষ কেবলই জিতবে, কেবলই অন্য-জগতের একটি উঁচু আসনের আদর্শ হ'য়ে থাকবে, এটা যেন ঠিক সহনীয় ছিলো না। কাজেই একটা শান্তির হাওয়া বইলো তাদের মনে। কাকের মুখে কথা ভাসে। শোনা গেলো রাত একটার আগে সে হস্টেলে ফেরে না, শোনা গেলো কোনো-কোনোদিন নেশা ক'রেও ফিরে আসে। কথাটা অবিশ্যি একদিক থেকে মিথ্যা নয়। ভালো লাগলে সারারাত গঙ্গার ঘাটেই সে ব'সে থাকে। চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে—নৌকোর ফাঁকে-ফাঁকে আলো-ছায়ার লীলা বেঁধে রাখে ওর মনকে। হাওয়া বইলে যখন সবাই জানলা বন্ধ করে—সে তখন অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়; ডেকে তার সাড়া পাওয়া যায় না, চোখের তারার পাশে-পাশে শিরাগুলো সব লালচে হ'য়ে ওঠে। কোনোদিন হয়তো কলেজে না-গিয়ে সারাদিন ছবিই আঁকে ব'সে-ব'সে। আসলে মনের গড়নটাই তার আলাদা। লোকের আকর্ষণ উদ্রেক করে, কিন্তু নিজে সে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তার অত্যন্ত লাল আর সুদৃশ্য হাতের তেলোর দিকে তাকিয়ে কত মেয়ের বুক থরথর করে, আর সমবয়সী ছেলেরা ভালোবাসায় পড়ে। নিঃশব্দে হেঁটে-হেঁটে যখন সে করিডর পার হয়—পাশে-পাশে ছেলেমেয়েরা কেমন একটা সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

দুর্নাম হ'লো তার। আর সেই দুর্নাম ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়াল ভেদ ক'রে মাস্টারদের কানেও গেলো—মাস্টারদের কুঞ্চিত কপালের রেখা থেকে পরিচিত মহলেও তা ছড়িয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে সে বাড়ি গেলো। পিসিমার অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা কিছুই বুঝলো না, বাবার গম্ভীর মুখও তাকে বিস্মিত করলো। নিভৃতে খবরটা দিলেন মা।

'তুই নাকি উচ্ছন্নে গেছিস ?'

'আমি! উচ্ছন্ন কী, মা ?'

'কী জানি বাপু, ভাইবোনে তো ক'দিন থেকে রাতদিন এ-ই জপছেন। তোর বিয়ে ঠিক করেছেন ওঁরা।'

'ও।' সুশান্ত বুঝলো এবার কথার তাৎপর্য—'তা বিয়েটা বুঝি এই রোগের ওষুধ ?'

'বোধহয়—' বিয়েতে যে মা-র সম্মতি নেই তা তাঁর কথার সুর থেকেই বোঝা গেলো। সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলো, 'তা তুমি কী ভাবো আমাকে ?'

'আমি !' সস্নেহে হেসে মা মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমাকে তো ওরা ভাবতে শেখায়নি, শান্ত, আমি কেবল তোকে ভালোবাসতেই পারি।' এমন আবেগভরে মা কথাটা বললেন যে সুশান্তর অন্তর আপ্লুত হ'য়ে গেলো—নিঃশব্দে মার হাত দুটো সে জড়িয়ে ধরলো কেবল। গলার স্বর নিচু ক'রে মা বললেন, 'আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তো কোনো মূল্য নেই, কিন্তু সত্যি বলতে এক্ষুনি তোকে বিয়ে দিয়ে হাত-পা বাঁধতে আমার ইচ্ছে করে না।'

সুশান্ত চুপ ক'রে রইলো। বলাই বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত মা বা ছেলে কারো ইচ্ছাই তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না। নরেনবাবু যদি বা কিছুটা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু দিদির কথার উপর কিছুই বলতে পারলেন না। সুশান্ত ছেড়ে দিলো নিজেকে, তারপর পিসিমারই এক দূর সম্পর্কের ভাসুরঝির সঙ্গে এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে গেলো তার। বিয়ের দিন মনটা অত্যন্ত ভারি রইলো সুশান্তর, তাছাড়া হাঙ্গামাতেও কাটলো। তার পরের দিন কালরাত্রি—একেবারে ফুলশয্যার দিন সে নিভৃত হ'লো স্ত্রীর সঙ্গে। সমস্ত ঘরময় ফুলের নিবিড় গন্ধ, বিছানাটি বেলফুলে সাজানো, খাট বেয়ে-বেয়ে নেমেছে ফুলের ঝালর। লাল টুকটুকে জরির পাড়-বসানো শাড়ি-পরা ফুলের গহনা-মোড়া বৌটির দিকে এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো সে। শাদা-শাদা পুষ্ট হাত, শাদা পাথরের মতো মুখের উপর একজোড়া ভাবলেশহীন বড়ো চোখ, শাদা গলা, ঝিরিঝিরি পাতাকাটা চুলের তলায় ছোটো

শাদা কপাল—দেখতে-দেখতে সুশান্তর হঠাৎ মনে হ'লো মানুষটা যেন বেঁচে নেই, যেন কফিন থেকে নিষ্প্রাণ একটি দেহ উঠে এসে বসেছে তার কাছে, ভয়ে বিস্ময়ে বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠলো। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলো জানালার বাইরে—উঠে এলো তার পাশ থেকে, মৃদু শব্দে একবার কাশলো—একবার নিশ্বাস ফেললো, তারপর সারা রাত ধ'রে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে কোনো-এক সময়ে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজেই চোখ বুজলো। বৌটি কী ভেবেছিলো কে জানে—একটুখানি ব'সে থেকে ঐ ফুলের মধ্যেই নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে।

বিয়ে উপলক্ষ্যে এমনিতেই পড়াশুনোর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিলো। পিসিমা বললেন, 'এক্ষুনি ওকে পাঠিয়ে দে, নরেন। তা নইলে বৌয়ের আঁচল ধরলে আর যেতে চাইবে না।'

পাঁচদিনের দিন চ'লে এলো সে আবার কলকাতা। আর বৌ গেলো তার পিত্রালয়ে। বাবা আর পিসিমা নিশ্চিন্ত হ'লেন, আর মার মনে হ'লো, 'এ ভালো হ'লো না।'

খবরটা রটতে দেরি হয়নি। তার বিবাহের খবরে বিশ্ববিদ্যালয় সচকিত হ'লো। মেয়েদের মনে নামলো মেঘের ভার। যে-মেয়েটির সঙ্গে সম্প্রতি একটু বেশি মেলামেশা চলছিলো, সে একদিন নিরালা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। কিন্তু সুশান্ত নিজে কিছুই পরিবর্তন অনুভব করলো না। জীবনে যে একটি নতুন মেয়ে অতি ঘনিষ্ঠ অত্যন্ত আপন হ'য়ে তার কাছে এসেছে, একবারও মনে পড়লো না সে-কথা। আপন পরিচিত জীবনের সীমাতেই সে রইলো আবদ্ধ হ'য়ে। তেমনি সে বিভোর হ'য়ে ছবি আঁকে—কখনো সারারাত গঙ্গার ঘাটের নরম ঘাসের উপর ব'সে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে—কৃষ্ণচূড়ার সমারোহে এখনো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিশ্ব-সংসার ভুলে যায়। কখনো বইয়ের অতলে ডুবে থেকেই নিঃশব্দ দিন কেটে যায় অলক্ষিতে।

পরীক্ষা এসে গেছে। ছাত্র-ছাত্রী প্রোফেসর সকলেই ঈষৎ চঞ্চল, সুশান্তও মনকে একাগ্র করেছে বইয়ের পাতায়। সে যে ফার্স্ট হবে এ-কথা সবাই জানে। সবচেয়ে ভালো জানে সে নিজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো তরফে বলাবলি চলেছে তাকে নিয়ে—পরীক্ষার পরে স্কলারশিপ দিয়ে বিলেত পাঠানো হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঝকঝক করতে লাগলো সুশান্তর চোখে। কিন্তু ঔজ্জ্বল্য এজন্য নয় যে ভবিষ্যতে সে একজন খ্যাতনামা লোক হবে, ভাবীকাল তাকে চিরকাল মনে রাখবে—তা নয়, সমুদ্রের অকূল জল তাকে টানে। চিত্রতীর্থ ইটালির মাটিতে

একদিন সে পা রাখবে—এ-কথা ভাবলেও বুকের মধ্যে শিরশির করে তার। দুই চোখ ভ'রে দেখে নেবে সভ্যতার সব কেন্দ্রস্থল—যাবে প্যারিসে, যাবে বার্লিনে—তারপর? তারপর ভাবনা তার বেশিদূর এগোয় না; বিহ্বল হ'য়ে একটা ভরা মন নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে কেবল।

পরীক্ষার দশদিন আগে সে চিঠি পেলো, তার বাবা মৃত্যুশয্যায়। পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে তাকে জানানো হয়নি আগে। ভালো ক'রে একটা চিকিৎসা পর্যন্ত করানো গেলো না। তাকে দেখে মা কেঁদে ফেললেন। গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে তার হাতের উপর হাত রেখে ব'সে রইলেন স্থবির হ'য়ে। কথা বেরুলো না মুখ দিয়ে। বাবা দুর্বল হাতে সুশান্তকে টেনে নিলেন কাছে—কত আকাঙ্ক্ষার এই তাঁর প্রথম সন্তান। ভিতরে-ভিতরে কত স্নেহ সঞ্চিত ছিলো তাঁর ওর জন্যে, ভবিষ্যতের কত আশা-জড়ানো এই ছেলে! স্তিমিত গলায় বললেন, 'শান্ত, ওগুলো ফিরিয়ে দে তোর মাকে। আমার ডাক এসেছে, কেন মিছিমিছি সর্বস্ব খোয়াবি।'

'বাবা, তুমি চুপ করো।'

'চুপ করবার সময় তো হ'লো, বাবা।'

'বাবা।'

'বাবা।'

'আমি তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাবো—'

অবুঝ হোসনে।'

'আমি আজই সব বন্দোবস্ত ক'রে আসবো। নিউমোনিয়া আজকাল তো একটা ছেলেখেলা—'

'তুই কি বোকা হ'য়ে গেলি? আমার সহায়-সম্বল কী, তুই জানিসনে? তুই চ'লে যা, পরীক্ষা দে।'

'সে হবে, তুমি কিছু ভেবো না—'

'ভাববো না?'—কোটরগত দুই চোখ জলে ভ'রে গেলো নরেনবাবুর। 'কত ভার দিয়ে গেলাম—'

মা ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'তুই ওঁর কথা শুনিসনে খোকা—আমার সর্বস্বর বিনিময়ে ওঁকে তুই ফিরিয়ে আন—কী হবে, কী হবে আমার এ-সব দিয়ে!' আবর্জনার মতো সব গহনাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি, আর সুশান্ত দুই হাত মুঠো ক'রে নিজের ব্যাকুলতাকে সংযত করবার চেষ্টা করলো।

একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা ক'রে সুশান্ত নরেনবাবুকে কলকাতা নিয়ে এলো—ভাইবোনেরা সজল চোখে দাঁড়িয়ে দরজা ধ'রে—পিসিমা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। মা এলেন সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। প্রায় তিন সপ্তাহ ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পরে মারা গেলেন নরেনবাবু। শুষ্ক চোখে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো সুশান্ত—মৃতদেহের বুকের উপর অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইলেন মা।

কোথায় রইলো প্যারিসের স্বপ্ন, কোথায় গেলো চিত্রতীর্থ ইটালির মায়া—আর কোথায় বা তার পরীক্ষা। একটা ফুৎকারে যেন ঈশ্বর সমস্ত আলো নিবিয়ে দিলেন তার চোখ থেকে। সদ্যবিধবা মায়ের দুটি রিক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে তার বুক একেবারে হু-হু ক'রে উঠলো। গঙ্গাতীরে বাবাকে শেষ ক'রে মাকে নিয়ে সে যখন ফিরে এলো—ছোটো-ছোটো ভাইবোনেরা কান্না-ভরা চোখে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে, শীর্ণ বুকে করাঘাত হেনে আপন মৃত্যুকামনায় উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন পিসিমা। সুশান্ত আর সময় পেলো না শোক করবার। তার পরিণত চেহারা দায়িত্বের গুরুভারে আরো গম্ভীর হ'লো।

অসুখের সময় খবর দেওয়া হয়েছিল বৌকে। শরীর খারাপের অজুহাতে সে এতদিন আসেনি, এবার তার বাবাই এলো তাকে সঙ্গে নিয়ে। বিয়ের আটমাস পরে এই আবার স্ত্রীর সঙ্গে সুশান্তর প্রথম মিলন। কিন্তু অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত আর বিমর্ষ অবস্থায় দিন কাটছিলো তার, আড়ালে আবডালে দেখা করবার মতো ইচ্ছা বা অবকাশ কিছুই তার ছিলো না। দুশ্চিন্তার ভারে প্রপীড়িত মন, কী হবে, কী ক'রে চলবে—মাথাটা এক-একবার যেন কেমন ক'রে ওঠে। কোথায় গেলো তার আকাশচুম্বী স্বপ্নের জাল বোনা, কে এমন ক'রে ছিঁড়ে এনে ফেললো তাকে এই সংসারের আবর্তে, কিছু ভেবে যেন দিশে করতে পারে না। ভিতরে-ভিতরে অতল জলে হাবুডুবু খায়, বাইরের চেহারা প্রশান্তিতে স্থির। সজল চোখে মা তাকিয়ে থাকেন অসহায়ের মতো—পিসিমা বিলাপ করেন—আর ভাইবোনেরা এর মধ্যেই তার উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে।

শ্বশুর বললেন, 'কী করবে ভেবেছো? পরীক্ষাটা তো আর দেওয়া সম্ভব দেখছি না।'

'না।'

'তবে?

সুশান্ত মাথা নিচু ক'রে রইলো। মুখ গম্ভীর ক'রে শ্বশুর বললেন, 'নরেন-বাবুর বোঝা উচিত ছিল যে এতগুলো ভার তোমার উপরে ফেলা ঠিক না।'

বিস্মিত চোখে শ্বশুরের দিকে তাকালো সুশান্ত। মৃত্যু কি কোনো আইন মানে?

'এত ফাইফুটুনি না-করলেও চলতো। তার উপরে নির্ভর ক'রেই আমি মেয়ে দিয়েছিলাম,—এখন তো দেখছি ঢাকের বাদ্যির মতো সবই ফাঁকি। এত বড়ো পরিবার ফেলে গেলেন, অথচ খাবার সংস্থান রেখে গেলেন না।'

আহত হ'য়ে সুশান্ত বললো, 'অত্যন্ত অসময়ে গেলেন তিনি, নইলে—'

'মৃত্যুর আবার সময় অসময় কী হে।' ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় ব'লে উঠলেন শ্বশুর, 'সে যখন খুশিই আসে—সেইজন্যেই তো ব্যবস্থা করতে হয় আগে থেকে।'

নিজেকে সংযত রেখে সুশান্ত বললো, 'তা যখন নেই তখন কী করতে বলেন আপনি?'

'সে-সব ব্যবস্থা করতেই আমার আসা। মেয়ে দিয়েছি যখন দায়িত্ব অবশ্যই আমার। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে এদের সবাইকে তুমি দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও—সীতা আমার ওখানেই থাকবে যতদিন সুবিধা না হয়। তুমি নিশ্চয় জানো, আর যাই থাক অর্থাভাব আমার নেই, ইচ্ছা করলে আমার কাপড়ের দোকানেও তুমি বসতে পারো, লগ্নি কারবারের ভারও আমি তোমার হাতে দিতে পারি—আর চাও তো চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ঘুষটুষ দিযে একটা চাকরিতেও—'

বাধা দিয়ে সুশান্ত গম্ভীর গলায় বললো, 'কী করবো তা আমি নিজেই স্থির করেছি।'

জামাইয়ের ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত হ'লেন ভদ্রলোক। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। ততোধিক গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তাহ'লে তা-ই করো। আমার এই প্রথম মেয়ে—তোমার অন্নাভাব তাকে আমি ভোগ করতে দেবো না।'

'বেশ তো, নিয়ে যাবেন তাকে।'

'বেশ।'

দস্তুরমতো একটা বিরোধের আবহাওয়া নেমে এলো শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে বৌ ঘরে এলো—এ দু'দিন সে শাশুড়ির ঘরে শুয়েছিলো—আজ তিনি এ-ঘরেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। হারিকেনের মৃদু আলোতে তার আবছা মূর্তির দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বললো, 'এসো।' দরজা বন্ধ ক'রে সীতা কাছে এসে বসলো। এই ক'মাসে সে অনেক বড়ো হয়েছে

মনে হ'লো সুশান্তর। ষোলো বছরের মেয়েকে যেন বাইশ বছরের যুবতী মনে হয়। একটু চুপ ক'রে থেকে সুশান্ত বললো, 'ভালো ছিলে ?'

'ছিলুম।'

আবার চুপচাপ। কেউ যেন কোনো কথা খুঁজে পেলো না। অথচ এমনও মনে হ'লো না যে পরস্পর যেন পরস্পরের অস্তিত্বেই বিহ্বল হ'য়ে আছে। তারা যেন কতকালের মানুষ—কতকাল এক সঙ্গে বসবাস করতে-করতে পুরোনো হ'য়ে গেছে—অবসন্ন হয়েছে। একটা নিশ্বাস পড়লো সুশান্তর। বললো, 'এই তো অবস্থা দেখছো, পরীক্ষাটাও দিতে পারলুম না। দুঃখ সইতে হবে তোমাকে।'

'শ্বশুরমশাই কি টাকা-পয়সা কিছুই রেখে যাননি ? এতগুলো লোক কি তোমার ঘাড়েই ?'

ষোলো বছরের তরুণী আর বাইশ বছরের যুবকের এই প্রথম দাম্পত্য আলাপ। স্ত্রীর কথায় একটু আবাক হ'লো সুশান্ত। এ-ধরনের কথা সে আশা করেনি। বিছানা থেকে আদ্ধেক উঠে ব'সে বললো, 'আমিই তো ওদের সব, কার ঘাড়ে যাবে ?'

'আমার মা তবে ঠিকই বলেছিলেন।'

'কী বলেছিলেন ?'

খুব সহজ গলায় সীতা বললো, 'বুড়ো তো শুধু ম'রেই গেলো না, মেরেও গেলো। সেইজন্যেই তো বাবা এলেন।'

বিস্বাদে ভ'রে গেলো সুশান্তর মন। কথা বলতে ইচ্ছা করলো না—আবার শুয়ে প'ড়ে সীতা বললো, 'তুমি আমাকে এত মাসের মধ্যে একটাও চিঠি লেখোনি কেন ? সবাই তোমাকে নিন্দে করেছে।'

'কী বলেছে ?'

'কী আবার বলবে, বলেছে যে কলকাতায় থাকে—কত সব মনভোলান মেয়ে আছে, তাই আর বৌকে মনে পড়ে না।'

'কে বলেছে ?'

'সবাই ! কেনই বা বলবে না, আমার বয়সী বন্ধুদের বরেরা হপ্তায় দুটো চিঠি লেখে—এমনকি কেউ-কেউ রোজও লেখে।'

'তাই নাকি ! তা তোমার বন্ধুরাও বোধহয় রোজ লেখেন।'

'আমিও তো লিখতুম।'

'রোজ লিখতে ?'

'রোজ লিখবো কেমন ক'রে, তুমি কি জবাব দিয়েছো ?'

'কিন্তু ও-চিঠিও কি তুমি লিখেছো ?'

সীতার মুখে একটা ছায়া ভেসে উঠলো। একটু কুণ্ঠিত গলায় বললো, 'বা রে ! আমি না-লিখলে কে লিখবে ?'

'হ্যাঁ, ঐ মোটা-মোটা অক্ষরগুলো নিশ্চয়ই তোমার, কিন্তু চিঠির কথাগুলো বোধহয় তোমার মা-র রচনা।'

'যাঃ !'

'সত্যি বলো।'

সীতা চুপ।

'ঠিক বলেছি কিনা—'

সীতা তবু চুপ ক'রে রইলো। সুশান্ত চোখে হাত চাপা দিয়েই কথা বলছিলো—সরিয়ে নিয়ে বললো, 'ও-সব প্রাণের দেবতা-টেবতা আর লিখোনা, বুঝলে ? একটা মানুষ আবার প্রাণের দেবতা হয় কেমন ক'রে ?'

এতক্ষণকার চুপ-করা সীতা এবার লাফ দিয়ে উঠে বসলো—বললো, 'হয় গো, হয়। স্বামী মেয়েমানুষের দেবতা ছাড়া আর কী ?'

নির্লিপ্ত গলায় সুশান্ত বললো, 'মেয়েমানুষের বলে না, মেয়েদের বলতে হয়। যাকগে, এবার ঘুমোও তুমি।' বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। ধীরে-ধীরে রাত গভীর হ'য়ে এলো।

পরের দিন সকালবেলা উঠেই দেখা গেলো শ্বশুর যাবার জন্য প্রস্তুত। কন্যাকে রেখে যাবার ইচ্ছা নেই, কিন্তু অশৌচ। এটা না কাটা পর্যন্ত থাকতেই হবে তাকে। অন্তত পিসিমা সেই অনুরোধই জানালেন। সুশান্ত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। শোনা গেলো, সুশান্ত স্ত্রীকে ভরনপোষণ করবার যোগ্য না-হওয়া পর্যন্ত কন্যা তার কাছেই থাকবে। আপাতত মেয়েকে তিনি রেখে গেলেন বটে, কিন্তু কাজ চুকে গেলেই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর খরচ-বাবদ পিসিমার হাতে একশো টাকার নোটও একখানা রেখে গেছেন। সুশান্তর মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠলো। দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে পিসিমাকে সে দগ্ধ ক'রে দিয়ে একশো টাকার নোটটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো তক্ষুনি। মনি-অর্ডরে ফেরৎ পাঠিয়ে শান্ত হ'লো।

দু'হাজার টাকার একটি লাইফ ইনশিওর ছাড়া নরেনবাবু আর-কিছুই রেখে

যেতে পারেননি। গেলেনও অসময়ে, তাছাড়া এত বড়ো পরিবার প্রতিপালন ক'রে আর উদ্বৃত্তও থাকতো না কিছু। সুশান্ত মানুষ হবে, বড়ো হবে—এই আশাটাই ছিলো তাঁর জীবনে। সাধ্যের অতিরিক্তও তিনি ব্যয় করেছেন তার পিছনে। পারিবারিক কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যই তিনি পছন্দ করতেন না। ছেলেপুলের খাওয়া থেকে শুরু ক'রে জামা-কাপড় আবদার সবই তিনি অম্লানবদনে স্বীকার ক'রে নিতেন। স্ত্রীর প্রতিও তাঁর অসীম যত্ন ছিলো। মাঝে-মাঝে দিদির মুখ-ঝামটা শুনতে হ'তো বটে কিন্তু তবু তিনি হাত গুটোতে পারেননি। অতএব পিতার বিরাট রিক্ত পরিবার নিয়ে কুড়ি বছরের কাঁচা মাথায় পঞ্চাশ বছরের দায়িত্বে সুশান্ত নীরবে মাথা নিচু করলো সংসারের উদ্যত দণ্ডের তলায়। মনকে সে বেঁধে নিলো শক্ত ক'রে, তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে, সকলের যথারীতি ব্যবস্থা ক'রে ধার-দেনা মিটিয়ে তার হাতে রইলো মোট তিনশোটি টাকা। টাকার দিকে তাকিয়ে মার চোখে ধারা নামলো, নিঃশব্দে তাঁর কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে সুশান্ত বললো, 'আমিই তো আছি মা।'

আগের মতোই রইলো সব ব্যবস্থা, দু'শো টাকা মার হাতে রেখে একশো টাকা নিয়ে ফিরে এলো সে কলকাতায়। অভ্যস্ত শারীরিক আরাম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললো নিজেকে। কতগুলো মুখ হাঁ হ'য়ে আছে তার দিকে—টাকা চাই, টাকা চাই। এই হ'লো তার একমাত্র মূলমন্ত্র। 'যে ক'রেই হোক, করতেই হবে কিছু—নিতেই হবে যে-কোনো কাজ—যদি বিনিময়ে পাওয়া যায় অর্থ। প্রতিভা আর বুদ্ধি রইলো প'ড়ে, উদয়াস্ত ছুটোছুটি করতে লাগলো উদ্‌ভ্রান্তের মতো। অন্তত মাসের শেষে শো দুই টাকা তো তার দরকার। নিজের স্ত্রী, বাবার স্ত্রী, পিসেমশায়ের স্ত্রী—আর একান্ত অসহায় সেই ছোটো-ছোটো পাঁচটি ভাইবোন। খরচ কি কম! দিক্‌বিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো একটি চাকরির সন্ধানে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—দেখতে-দেখতে মানুষটি যেন একেবারে বদলে গেলো। মাথার অবিন্যস্ত ঘন চুল পাৎলা হ'য়ে গেলো, ফুটো হ'লো জামা জুতো—মসৃণ ত্বক ধূসর হ'লো রুক্ষতায়।

এদিকে মাসতিনেক মা চুপ ক'রে ছিলেন, কিন্তু আর পারলেন না। সকালবেলা ধারের দোকানে চা প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফিরে এসে সুশান্ত একখানা মোটা-সোটা চিঠি পেলো তাঁর। পিসিমা বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী—মালিশ কেনবার পয়সা কই, ছোটো ছেলেটা জ্বরে ধুঁকছে সাত-আটদিন, তার আগে বড়ো মেয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জায়

ভুগে উঠলো—ইস্কুলের মাইনে বাকি দু'মাসের—তারা নাম কাটতে চায়—দোকানি ধার দেয় না, উপরন্তু কথা শোনায়, ইত্যাদি ইত্যাদি—তার উপরে বৌমার মুখভার—এই কষ্ট সে সইতে রাজি নয়, বাপকে সে লিখে দিয়েছে নিয়ে যাবার জন্য। ঝি-চাকর তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন, ছোটো একটা অল্প ভাড়ার বাড়িও দেখে রেখেছেন—কিন্তু তাহ'লেও তো—

চিঠিটি ঝাপসা হ'লো সুশান্তর চোখে। চোখের কোণে দুশ্চিন্তার কালো রেখাটা আরো একটু ঘন হ'লো। খানিক ব'সে রইলো চুপ ক'রে—তারপর নিশ্বাস নিয়ে তাকালো সে বাইরের দিকে—সঙ্গে-সঙ্গে চোখ তার নিবদ্ধ হ'লো আকাশের উপর। কী সুন্দর! স্বপ্নে ভারাতুর হ'য়ে উঠলো চোখ—আশ্চর্য, আকাশ এত নীল, এত সুন্দর—আকাশে এত শান্তি!

ক'দিন থেকেই একটা প্রাইভেট টিউশনির কথা ভাবছিলো সুশান্ত। ইতিমধ্যে ক'মাস একটা ইস্কুলমাস্টারিও করছিলো, কিন্তু মাসের শেষে তা থেকে যে ক'টা টাকা উপার্জন হয়, তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে নানাদিক ভেবে সেটা সে ছেড়ে দিয়েছে। তার চাইতে সে-সময়টায় ছবি আঁকলে তার উপার্জন বেশি হবে—অথচ কাজও খানিকটা মনের মতো। খানিকটা এইজন্য যে সব ছবিই তো কোনো-না-কোনো বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য আঁকা। একেবারে মনের মতো আঁকার তার অবসর কই? প্রাইভেট টিউশনি করতে কোথায় যেন তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে-ঘুরে ছাত্র পড়ানো বা ছবি আঁকায় তালিম দেয়া কিছুতেই ভালো লাগে না তার। কিন্তু ভালোমন্দ বা মান-সম্মানের তো আর প্রশ্ন নেই তার জীবনে—ঘন-ঘন টাকার তাগাদা আসছে মার কাছ থেকে—ছোটো বাড়িতে গিয়ে, সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে, ছেলেমেয়েদের জামাজুতো সংক্ষেপ ক'রে, কিছুতেই তো কিছু হচ্ছে না—কেবলি বাড়ছে ধার—এর পরেও কি মান আর সম্মান, ভালো লাগা আর মন্দ লাগার প্রশ্ন উঠতে পারে? মন স্থির ক'রে ফেললো সে। কিন্তু এক্ষুনি কিছু টাকা না-পেলে যে ভাইবোনদের ইস্কুলে নাম কাটা যাবে, এ-কথা ভেবে সে ব্যাকুল হ'লো।

কী করি! কী করি! খশখশিয়ে কাগজের বুকে রং লাগাতে বসলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবলো ভাবনা চিন্তা, মন শান্ত হ'য়ে এলো—অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কোনো কষ্ট হ'লো না। তারপর সূর্য যখন আকাশ-পরিক্রমা শেষ ক'রে পশ্চিমের দরজায় পা রাখলো, তখন ভাঙলো তার তন্ময়তা। চোখ তুলে তাকালো একবার

বেলার দিকে—চোখ ফিরিয়ে ঘরের মেঝেতে নামালো দৃষ্টি—ধামা-চাপা আছে মেসের ঠাণ্ডা ভাতের রাশি।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে একবার একটা কথা উঁকি দিলো তার মনে। তার শ্বশুর কি এই দুঃসময়েও কিছু ধার দেবেন না তাকে? অন্তত তাঁর কন্যা! কথাটা মনে হ'তেই অসম্ভব ব'লে সুশান্ত অন্য চিন্তায় মন দিলো, কিন্তু ঘুরে-ফিরে একটি কথাই বারে-বারে গুঞ্জন করতে লাগলো তার মাথায়। যুক্তি খুঁজলো মনে-মনে—কেন দেবেন না,—তিনি না দিন, তাঁর কন্যা তো দেবে? তার হাতেও যথেষ্ট টাকা আছে। আমি প্রতিনিয়ত যে লাঞ্ছনা ভোগ করি, তাতে কি তার কোনো অংশ নেই—কোনো বেদনাবোধ নেই? কেন থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। ভাবতে-ভাবতে উত্তেজনা বোধ করলো সুশান্ত। ভালো ঘুম হ'লো না সারা রাত। পরের দিন ভোরে উঠেও দেখলো সেই একই চিন্তা ঘুরছে তার মাথায়। সারাদিন নানা কাজের ভিড়ে কাটলো। তারপর বিকেলবেলা স্নান ক'রে কাপড় বদলে প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই সে শেয়ালদ স্টেশনে এসে হাজির হ'লো। নৈহাটি এমন কিছু দূরের রাস্তা নয় কলকাতা থেকে, কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে এই তার প্রথম যাত্রা। শ্বশুরেরও অবিশ্যি কোনো আহ্বান ছিলো না।

ভিড়ে ভারাক্রান্ত ট্রেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ফেরবার সময় এটা। পকেটে হাত দিয়ে একটু চিন্তা ক'রে একখানা থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনলো সে। তারপর গুঁতোগুঁতি ক'রে উঠে বসলো সেই হাটের মধ্যে। চলতে লাগলো ট্রেন—কলকাতার ইঁট-কাঠ ছাড়িয়ে সবুজ-সবুজ পানাভরা ডোবা দেখা দিলো,—দেখা দিলো ঝোপঝাড়। ধানের খেতের আল বেয়ে হাঁটা, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকা মানুষ—উলঙ্গ শিশু—ময়লা শাড়িপরা ঘোমটা-টানা বধূ—তারপর নামলো অন্ধকার। চলন্ত ট্রেনের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ নাম-না-জানা কোনো-একটা স্টেশনে নেমে পড়লো সে। তাকে নামিয়ে আধ মিনিটের মধ্যেই হুশহুশ ক'রে যখন আবার ছেড়ে দিলো ট্রেন, একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস নিয়ে চোখ ফিরিয়ে সে স্টেশনের নামটা পড়তে চেষ্টা করলো, তারপর একটা মালগুদামের পাশে একটা কাঠের বাক্সের উপর ব'সে রইলো চুপ ক'রে। কখন আবার গাড়ি আসবে কে জানে—তখন সে ফিরতে পারবে—কিংবা পারবেই কিনা—কোনো ভাবনাই তার মনে এলো না। শক্ত কাঠের উপর ব'সে-ব'সে সে দেখলো আবছা-আবছা সন্ধ্যা রাত্রির কালোতে

গভীর হ'য়ে এলো। দূরে রেললাইনের ওপারে জ্ব'লে উঠলো অগুনতি জোনাকি—ঝিঁঝিঁর ডাকে রাত্রি যেন থমথমে হ'য়ে উঠলো তখুনি, টিমটিম ক'রে স্টেশনে দুটো আলোও জ্বলছিলো। ট্রেনটি আসবার সময় হঠাৎ যেন কারা ভিড় করছিলো—ট্রেনটা চ'লে যেতেই আবার তারা মিলিয়ে গেলো কোথায়। কেমন একটা অটল নিস্তব্ধতার শান্তিতে নিজেকে খুঁজে পেলো সুশান্ত, মায়ের চিঠির অশ্রুভরা বেদনা আর তার মনকে বিবশ ক'রে রাখলো না। কোনো দুর্বল মুহূর্তে শ্বশুরের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার দাবি, স্বামী দরিদ্র ব'লে যে-স্ত্রী সুখভোগের লিপ্সায় পিত্রালয়ে চ'লে যায় তার কাছে দুঃখের আবেদন—এ থেকে মুক্তি পেলো সে। নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়ে রইলো তারা-ভরা আকাশের দিকে।

এর কয়েকদিন পরে ঘরে ব'সে একটি বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকছিলো সুশান্ত—ভেজানো দরজাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে এক ভদ্রলোক মাথা গলালেন ভিতরে, তারপরেই আনন্দিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—'এই তো!' শব্দ ক'রে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে নিজে ঢুকলেন, পিছনে তাকিয়ে বললেন, 'এসো'। সচকিত হ'য়ে চোখ তুললো সুশান্ত, ভালো ক'রে না-তাকিয়েই অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলে, 'কে?'

'আমি হে, আমি। তুমি কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন—কত খোঁজ ক'রে—'

এইবার সেই কণ্ঠস্বর গিয়ে হাতুড়ির ঘা মারলো সুশান্তর বুকের ভিতর। 'মাস্টার মশায়!' দ্রুতপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচু হ'য়ে পায়ের উপর হাত রাখলো সে। পিছনে মিসেস চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে আবেগে চোখ জলে ভ'রে গেলো।

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, 'আজকেই একটি ছাত্রের মুখে খবর পেলাম তুমি এখানে আছো। এই ভাখো, ইনিও এলেন তোমাকে দেখতে—তারপর? ব্যাপার কী বলো তো?'

জবাব দিতে গিয়ে একসঙ্গে এক সমুদ্র কথা ভিড় ক'রে উঠলো তার বুকের মধ্যে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা—কোথায়? কোথায় গেলো সব? বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ছাত্র—বৈজ্ঞানিক চ্যাটার্জির প্রিয়তম শিষ্য সুশান্ত—কোথায়? কোথায় সে? সংসারের নিষ্পেষণে বিচূর্ণ এই যে মানুষটা এতক্ষণ ধ'রে বিজ্ঞাপনের জন্য চুল-এলানো স্তন্যদাত্রী বিগলিত মায়ের ছবিতে রং দিচ্ছিলো, তার সঙ্গে কোথায়

তার যোগসূত্র? খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে সে কথা বার করতে পারলো না। কতদিন পরে সে দেখলো এঁদের—এঁদের সস্নেহ মুখশ্রী যেন মুহূর্তে ফিরিয়ে আনলো তার পুরোনো দিন, যে-সব দিনের তিলতম স্মৃতিও সে মুছে দিতে চেয়েছিলো মন থেকে, তা যেন একেবারে ঝলমলে হ'য়ে উঠলো সূর্যালোকের মতো। ব্যস্ত বিব্রত হ'য়ে দু'হাতে খাটের উপরকার রং তুলি বই আবোল-তাবোল সব সরিয়ে ফেলে অসহায় গলায় বললো, 'কোথায় যে বসতে দেবো আপনাদের, এই তো আমার ঘর।'

'সুন্দর ঘর—' সস্নেহে মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'তুমি যে বৈজ্ঞানিকের চেয়ে শিল্পী বেশি, তারই প্রমাণ এই ঘর।' মৃদুহাস্যে মাথা নিচু করলো সুশান্ত। নানা উপলক্ষ্যে তাকে কত যেতে হয়েছে এঁদের বাড়িতে। এই ভদ্রমহিলার সযত্ন মার্জিত ব্যবহারে কতবার সে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তার অদর্শনে তাঁরা যে কখনো এমন ক'রে কাছে আসতে পারেন,—এ-কথা সে কল্পনাও করেনি। নিজের ভাগ্যের জন্য অদৃশ্য দেবতার কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানালো। একটু পরে মুখ তুলে বললো, 'আমার যাওয়া উচিত ছিলো।'

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, 'আমরা তো ভাবছি হঠাৎ তোমার কী হ'লো। তোমার বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলাম—কিন্তু তার জন্য তুমি যে পরীক্ষাটাও দিতে পারবে না তা ভাবিনি। তুমি আমার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় ছিলে, তোমার মতো ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র আমি আমার পঁচিশ বছরের শিক্ষকতায় দেখিনি।' মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'তা ও-বছর না-হয় গেছে—পরীক্ষাটা তো তুমি এ-বছরও দিতে পারতে।'

নিশ্বাস ফেলে সুশান্ত বললো, 'সে আর হয় না।'

'কেন? কী তোমার এমন অসুবিধে। সব তো তোমার প্রস্তুতই ছিলো।'

'আমি কেমন ক'রে বোঝাবো যে কতগুলি প্রাণী একমাত্র আমাকে নির্ভর ক'রেই বেঁচে আছে। আমার পক্ষে পরীক্ষার কথা এখন স্বপ্ন।'

ডক্টর চ্যাটার্জি মাথা নেড়ে বললেন, 'শুনেছি কিছু-কিছু, কিন্তু—'

'তোমার বাবা কি কিছুই রেখে যাননি?' মিসেস চ্যাটার্জি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'অন্তত একটা বছরও চলতে পারে এমন-কিছু—'

অত্যন্ত কুণ্ঠিত গলায় সুশান্ত বললো, 'অত্যন্ত অসময়ে গেলেন, তা ছাড়া—' কথা শেষ না-ক'রেই সে চুপ করলো।

একটু চুপ ক'রে রইলো সকলেই। ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, 'তুমি তো আমার কাছেও থাকতে পারো। এই মেসটা তত ভালো দেখছিনে।'

'ভালোমন্দ ছেড়ে দিলেও তুমি যদি আমাদের ওখানে গিয়ে থাকো আমরা খুবই খুশি হই।' মিসেস চ্যাটার্জির গলায় আন্তরিকতা ফুটে উঠলো।

'আমার পক্ষেও তো সেটা কম সৌভাগ্যের নয়, কিন্তু—'

'কিন্তু কী বাবা—আমি তোমার মায়ের মতো, আমার কাছে তোমার তো সংকোচের কারণ নেই।'

ডক্টর চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন স্ত্রীর কথা। বললেন, 'তুমি বোধহয় জানো না যে আমার ছেলেটি মাসখানেক যাবৎ বিলেতে গেছে, এঁর মন আর টিঁকছে না বাড়িতে। ক'দিন থেকে ক্রমাগত তোমার কথা বলছিলেন ইনি। আর ভাবছি ওখানে গেলে হয়তো কিছু-কিছু পড়াশুনোও হবে তোমার—আমি তো আছি।'

সুশান্ত কী বলবে। এই অযাচিত ভালোবাসার কি কোনো তুলনা আছে? এখানে কি আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন তুলে এঁদের অসম্মান করবে? দু'একবার আপত্তি জানিয়েই সে রাজি হ'তে বাধ্য হোলো। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'আমার মেয়েকে কিন্তু পড়াতে হবে। লেখাপড়ায় সেও খুব ভালো। আই. এস.-সি. দিচ্ছে সামনের বছর।' একটা যে কিছু বিনিময় করতে পারবে এ-কথাটা ভেবে সুশান্ত খুব লাঘব বোধ করলো—খুশি হ'য়ে বললো, 'নিশ্চয়ই।'

পরের দিনই মেসের পর্ব চুকিয়ে একরাশ তুলি আর ছবির কাগজ বুকে ক'রে উঠে এলো সে চ্যাটার্জির বাড়িতে। মেসের বাচ্চা চাকরটা ছলোছলো চোখে কাছে এসে দাঁড়ালো, বদমেজাজি ঝিটা বিষণ্ণ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে, ঠাকুর এসে মুখ নিচু করলো—মমতায় বুক ভ'রে গেলো সুশান্তর। ব্যাগের মুখ খুলে উপুড় ক'রে ঢেলে দিলো তাদের হাতে—তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এলো রাস্তায়।

যাবার সময় সায়েন্স কলেজটার পাশ দিয়ে ইচ্ছে ক'রেই ঘুরে গেলো সে। কত মধুর সকাল, কত বিনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে তার এখানে কাজ করতে-করতে; সাফল্যের আভায় উদ্ভাসিত চ্যাটার্জির প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কত সময় ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হ'য়ে উঠেছে তার মন। অনেকদিন পরে বড়ো ভালো লাগলো তার। একটুখানি সময়ের জন্য অভাব অভিযোগ মুছে গেলো

মন থেকে। মিসেস চ্যাটার্জি হাসিমুখে দরজা খুলে দিলেন। তাঁদের আটপৌরে শাড়ি আর ব্লাউজে যেন তাঁকে আরো কাছের মানুষ ব'লে মনে হ'লো আজ। তাঁর পিছনে-পিছনে তাঁর মেয়েও এসে দাঁড়ালো। এর আগে যতদিন সে এসেছে, এসেছে অতিথির মতো। আর আজ এলো সে ঘরের ছেলে হ'য়ে। তাই মা-মেয়ের যুক্ত অভ্যর্থনা নিতান্ত আপনজনের মতো অভিনন্দিত করলো তাকে। চকিতে একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'উনি এতক্ষণ তোমার আশায় থেকে এইমাত্র বেরুলেন একটু। এসো। কণা, যা তো বাবা, হরিকে পাঠিয়ে দে, ওর জিনিশগুলো তুলে নিক।'

কৌতূহলী হ'য়ে কণা বললো, 'ঐ ইজেলটা কার? আপনি ছবি আঁকেন?'

'জানিসনে?'—মিসেস চ্যাটার্জি জবাব দিলেন—'ওর হাত অত্যন্ত ভালো। সেদিন তো ডক্টর রায় ওর কথাই বলছিলেন। নানা কাগজেই তো আজকাল ওর ছবি বেরুচ্ছে।'

'মজা তো—' অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতো কণা বললো, 'আমি বেশ শিখতে পারবো আপনার কাছে।'

'যতটুকু পারি নিশ্চয়ই আপনাকে শেখাবো।' মৃদু হেসে বিনীত গলায় বললো সুশান্ত।

হরি এলো। অতি সামান্য জিনিশ। তুলে নিতে সময় লাগলো না। মিসেস চ্যাটার্জির নির্দেশমতো সে এবার তার জন্য নির্ধারিত ঘরটিতে গিয়ে নিঃসঙ্গ হবার সুযোগ পেলো।

এখনো, এত বছর পরেও সুশান্তর মনে পড়ে তাঁদের কথা। মিসেস চ্যাটার্জির সস্নেহ সযত্ন নিখুঁত ব্যবহার, ডক্টরের শুভকামনা; তাঁদের বলা-কওয়ার ভঙ্গি, এমনকি তাঁদের কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পায় সে। অথচ তাদের মেয়েটি—মেয়েটিকে কী জানি কেন কিছুতেই মনে পড়ে না আর—তার ব্যবহারটা পর্যন্ত আজ আবছা হ'য়ে এসেছে সুশান্তর কাছে। কিন্তু সেই সময়ে কত কাছে এসেছিলো সে, কত দুঃখ পেয়েছিলো সে সুশান্তর জন্য। দুঃখের উপলক্ষ্য হ'লেও তার নিজের তো কোনো দোষ ছিলো না। মন দিয়ে পড়িয়েছে তাকে, ছবি আঁকা শিখিয়েছে, তার পরীক্ষার সময় অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে নিজের শরীর পর্যন্ত খারাপ ক'রে ফেলেছিলো। কিন্তু তার মধ্যে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর-কিছু কি ছিলো? এমন-কী কিছু ছিলো যাতে কণা তিলমাত্রও

ভুল বোঝার অবকাশ পায়? অথচ কোনো-একদিন হঠাৎ সে অনুভব করলো কণা তাকে ভালোবেসেছে। যেন একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে সে। কেমন অগোছালো হাবভাব, চলাফেরার মধ্যে যেন কেমন একটা বেদনার ছায়া, আগের মতো কথা বলে না, তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'লে নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নেয়। মেলামেশার সেই সহজ ভঙ্গি কে যেন শুষে নিয়েছে তার ভিতর থেকে।

অত্যন্ত বিপর্যস্ত ছিলো সেদিন সুশান্তর মন। মার চিঠি এসেছে, বাবার বাৎসরিক কাজের জন্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। তাছাড়া অন্যান্য অভাবের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। উপরন্তু তার শ্বশুরের লেখা একখানা চিঠি। পিসিমা এ-সময় বৌকে আনাবার কথা লিখেছিলেন, না এলে ভালো দেখায় না—তারই জবাব। চিঠিখানার ভাষা সুখশ্রাব্য নয়, এবং তার ভিতরে জামাইয়ের প্রতি যে-মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন তাও অসহ্য, কিন্তু সব চাইতে অসহ্য তাঁর অভদ্র ইঙ্গিত তাদের দারিদ্র্য নিয়ে, তার মৃত বাবার উদ্দেশে অপমান জানিয়ে। পিসিমা কিছু অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন হয়তো, তারও জবাব আছে পুনশ্চ দিয়ে, 'আমার এত অর্থ নেই যাতে কাউকে সাহায্য করতে পারি—তাছাড়া এটা আমি নীতিবহির্ভূত ব'লেই মনে করি, কেননা অযোগ্যকে সাহায্য করা মানেই তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। সুশান্ত যদি আমার এখানে এসে থাকে আমি আমার কাপড়ের কারবারে তাকে বসিয়ে দিতে পারি—মাইনে পাবে—খাওয়া-দাওয়ার খরচ লাগবে না—'

ক্ষোভে, অপমানে, সুশান্তর সর্বশরীর জ্ব'লে গেলো, পিসিমার উপরেই তার রাগ হ'লো বেশি। এই ভদ্রমহিলাই তো ডেকে আনলেন এত বড়ো অপমান—আর এঁর জন্যই তো সুশান্ত বাধ্য হয়েছিলো বিয়ে করতে। চিঠিটা হাতের মুঠোয় পাকাতে-পাকাতে ছিঁড়ে ফেললো, একটা অসহ্য উত্তেজনায় পাইচারি করতে লাগলো সারা ঘরে। এক সময় লক্ষ্য ক'রে দেখলো, কখন কণা এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধ'রে—অত্যন্ত শুকনো মুখ—বিষাদে বিবর্ণ চেহারা। নিজের উত্তেজনাকে তক্ষুনি সংযত ক'রে হাসিমুখে বললো, 'আসুন, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম আজ আমাদের ছবি আঁকার দিন।'

কণা নড়লো না সেখান থেকে, একটি কথা বললো না—একবার কেবল চোখ তুললো—সুশান্ত দেখলো সে-চোখ জলে ভরা।

'কী হয়েছে? কোনো অসুখ করেনি তো?'

'না।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'আপনাকে কেমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে। তাছাড়া ক'দিন থেকে—'

'আমার কিছু হয়নি—' কণার গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সে।

সুশান্ত একটু চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর বললো, 'পাঁচ মাস হ'য়ে গেলো এখানে আছি, কেবল তো আপনাদের যত্ন নয়, আপনাদের সঙ্গসুখেও যে আমি কত সুখী, কত কৃতজ্ঞ—'

'আপনি কি কেবল কৃতজ্ঞ হ'তেই জানেন, আপনার মনে কি আর-কিছুই নেই?' কথা বলতে-বলতে থরথর ক'রে কাঁপছিলো কণার গলা।

সুশান্ত অবাক হ'য়ে বললো, 'এ-কথা বলছেন কেন?'

'কেন?' কণা দু'হাতে মুখ ঢাকলো নিচু হয়ে—দু'পাশ থেকে ভিজে-ভিজে কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো বুকের উপর। সুশান্ত স্তব্ধ হ'লো। নির্জন দুপুর, নিরালা ঘর—বুকের মধ্যে যেন কেমন ছমছম ক'রে উঠলো তার। মুহূর্তকাল থমকে রইলো, তারপর বললো, 'বুঝেছি।'

'কিছুই বোঝেননি, কিছুই বোঝেননি আপনি—'

সস্নেহে কণার মাথার উপর একখানা হাত রেখে খুব শান্ত স্বরে সুশান্ত বললো, 'আপনি তো জানেন আমি বিবাহিত।'

'জানি।'

'তবে?'

'এও জানি যে স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সংস্রব শিথিল।'

'কিন্তু কর্তব্য?'

'জীবনে কি কেবল কর্তব্যটাই বড়ো? হৃদয়ের কি কোনোই মূল্য নেই?'

'হৃদয়বৃত্তিটা একটু যদি কম থাকতো আমার তাহ'লে আমি যে বেঁচে যেতাম। কিন্তু এ আপনি কী করলেন? কেন এই অযোগ্যকে এতখানি সম্মান দিলেন?'

'অযোগ্য! তুমি অযোগ্য! হায়রে!' কণার কান্না-ভরা মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। জলে-ভেজা মুখ আর গালের উপর উড়ে-পড়া ছোটো-ছোটো চুল মিশে গেলো সেই হাসির সঙ্গে। সুশান্তর শিল্পী মন আর চোখ হঠাৎ স্থির হ'লো সেখানে, ক্ষণেকের জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা তাকে আত্মবিস্মৃত করলো,

ধীরে-ধীরে মুখ নিচু করলো সে কণার মুখের উপর। কিন্তু পরমুহূর্তেই দ্রুত স'রে দাঁড়ালো, ধিক্কার দিলো নিজের অসংযমকে, তারপর ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে-যেতে বললো, 'আপনি শান্ত হোন, আমি আসছি।' তারপর দু'দিন পর্যন্ত ভারি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে রইলো সুশান্ত। কী যে করবে, কী যে করা উচিত কিছুই ভেবে পেলো না। এতদিনের অত ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, অত সুযোগ সুবিধের মধ্যেও এ-ভুল তো তার কখনো হয়নি। কণা আশা করেছে, অভিমান করেছে—অনেক কথা যা কোনোদিন সুশান্ত ভাবেনি, আজকের কণাকে দেখে সে-সব কথা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো তার মনে—কতদিন কণার চোখে একটা তীব্র বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়তে দেখেছে সে, অথচ কেন, সে-প্রশ্ন কোনোদিন মনে ওঠেনি তার। দৈহিক সংস্পর্শ সম্বন্ধে আসলে সে অচেতন। কেন অচেতন? কেন তার ভালো লাগে না এ-সব? এ-প্রশ্ন সে নিজেকেই অনেকবার করলো—তারপর তৃতীয় দিন রাত্রির কোনো-এক মুহূর্তে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ডক্টর চ্যাটার্জির সৌম্য প্রশান্ত মূর্তিকে স্মরণ করলো মনে-মনে—মিসেস চ্যাটার্জিকে অনুচ্চারিত গলায় দু'বার মা ব'লে ডাকলো—অসংখ্য প্রণাম রাখলো তাঁদের জন্য—প'ড়ে রইলো বিছানা, বালিশ, বাক্স—কেবলমাত্র রং তুলি আর প্রায় শূন্য মনিব্যাগটি তুলে নিয়ে কোনো-এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় পা বাড়ালো চোরের মতো নিঃশব্দে।

সে আজ কোন যুগের কথা—মনেও পড়ে না ভালো ক'রে। দশ বছরের পলিমাটি পড়েছে স্মৃতির উপরে। কত ফুটপাথ আর পার্কের বেঞ্চি—সারা রাত জেগে পোস্টরে রং লাগানো—বিনিদ্র রাত্রির পরে কত স্নিগ্ধ সকাল আর সকাল-বেলার রাজপথে কত মানুষের বিচিত্র মিছিল, কত দৃশ্যের পুনরুক্তি—ছবির মতো ভেসে-ভেসে ওঠে আজ। শিখদের মোটা রুটি আর মাটির গেলাশে ক'রে কালো রংয়ের চা। কচি-কচি ভাইবোনেদের বিষণ্ণ বিবর্ণ চেহারা, মায়ের ব্যথিত মুখচ্ছবি, দরিদ্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনাসক্তি—কিছুই কি ভুলে যাবার? কিন্তু কে তার সাক্ষী? সেই সুদীর্ঘ বছরের পর বছর পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস আজ কে মনে রেখেছে? ভাইবোন? স্ত্রী? মা? কে? মেয়ের বিয়ের সময় মা বলেছেন, 'গরিবের ঘরে বাবা মেয়ে দেবো না—হোকগে ভালো পাত্র। গরিবদের মন বড়ো নিচু।' সুশান্তর মন কি নিচু ছিলো? কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে-কথা? পিসিমা দেখে যাননি এই সমৃদ্ধি, তিনিই ছিলেন জলন্ত সাক্ষী, তিনি নেই। বুড়ো বয়সের অনেক লোভ আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি মরেছেন। আজো কোনো

ভালো জিনিশ খেতে গেলেই তার পিসিমাকে মনে পড়ে, চোখ জলে ভ'রে যায়।

আজ স্ত্রী ফিরে এসেছেন তাঁর ধনী স্বামীর উপর স্ত্রীত্বের সকল অধিকারের দাবি নিয়ে কর্তব্য করতে, প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়ায় ভাইদের শরীর মসৃণ—বোনেরা বড়ো-বড়ো ঘরের বৌ, মা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর তিলতম ইচ্ছাটিও অপূর্ণ রাখে না সুশান্ত। কিন্তু তার নিজের? এই যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজের সকল অস্তিত্বের বিনিময়ে এত স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে সে সকলের জন্য, সে-কথা কি কেউ একবার চিন্তা করে? তাব এই বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনেও যে কোনো চাহিদা আছে, কেউ কি মনে কবে সে-কথা? সে নিজেও কি মনে রেখেছিলো এতদিন? ঘুম ভেঙে উঠে সকলের সব চাহিদা মাথায় নিয়ে কাজে ঢুকতো, আর ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে ফিরে আসতো আলো জ্বললে। মাঝে-মাঝে কোন-এক অনির্দেশ্য ব্যথায় বুকটা যেন কেমন ক'রে উঠতো—কিন্তু সে তো ক্ষণিক। জীবনের এই মধ্যাহ্নে এসে সকল ইচ্ছাকেই সে ভুলে যেতে পেরেছিলো। উঠতে হবে, দাঁড়াতে হবে, দারিদ্র্যের সমস্ত লাঞ্ছনার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে, এই মন্ত্রটিই ছিলো তার যৌবনের সাধনা—সুখ-দুঃখের সকল চেতনাকে সবলে উৎপাটিত করেছিলো হৃদয় থেকে। অভাব যে কী ভয়ংকর, গরিব হয়ে বেঁচে থাকা যে কত দুঃখের, সংসার যে কত নিষ্ঠুর—তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন মন প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত প্রতিপলে তা অনুভব করেছে—আর আজ? নিয়েছে তার যোগ্য প্রতিশোধ! তার সম্মান, তার প্রতিপত্তি—তার প্রতি সকলের অহেতুক মনোযোগ—সব সে আদায় ক'রে নিয়েছে কড়াষ-ক্রান্তিতে। কিন্তু তবু তৃপ্তি কই? তার মন কি এই চেয়েছিলো? মাঝে-মাঝে কাজ করতে-করতে আকাশটা চোখে পড়ে, মন উধাও হ'য়ে যায়। কী যেন সে পায়নি, কী যেন পাবার ইচ্ছায় আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করে। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই তার সেই চাওয়া, কিন্তু হাত বাড়ালে দেখে সেই সামান্য পাওনাটুকুও তার জন্য কেউ সঞ্চয় ক'রে রাখেনি।

ছবি আঁকারই কাজ করে সুশান্ত। কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের ছবি। হাজার টাকা পায় বিজ্ঞাপনের আপিশে. তাছাড়া প্রয়োগশিল্পে তার মতো ওস্তাদ আজ ভারতবর্ষে ক'জন? আজকের দিনে সারা ভারতবর্ষে এমন-কোন বিশেষ বাড়ি আছে, যার মধ্যে সুশান্তর মাথা এক. ঘণ্টার জন্য নিবিষ্ট হ'লেও তিলমাত্র দ্বিধা না-ক'রে তারা মুঠো-মুঠো টাকা বার ক'রে দিতে না পারে? তার মতো রঙের

সমাবেশ আনতে পারে ক'জন? তার প্রতিভার দাম সে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়েছে। টাকা! টাকা! কত চাই? দু'হাতে আনবো, ছড়াবো, ছিটোবো,— আর হৃদয় হবে সেই টাকারই স্তূপের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত। এতদিনে নিবে এসেছে তার উত্তাপ, সে এবারে ঠিক মরেছে, বিক্রীত হয়েছে তার অশান্ত আত্মা এই পার্থিব সংসারের মোটা-মোটা টাকার অঙ্কে। জীবনের উপর এই তো তার চরম প্রতিশোধ। নাও, নাও, হে সংসার! কত নেবে নাও—রাশি-রাশি দিয়ে পূরণ করো তোমার গহ্বর। আর্থিক উন্নতির চরম শিখরে উঠে হৃদয়ের সকল সূক্ষ্ম অনুভূতিতে টিপে-টিপে মারলো সে। এই কিছুকাল আগেও যে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে একটা দুর্জয় অভিমানবোধ ছিলো তার মনে, সেটা সে মুছে ফেলতে পারলো এতদিনে। মনকে বোঝালো, এই তার জীবন। সকল প্রবৃত্তিকে পোষ মানালো কুকুরের মতো। আকাশে মেঘ করলে কে তাকায়? পূর্ণিমার রাত্রিতে আর কার হৃদয়ে সমুদ্রের জোয়ার নামে? বর্ষায় আর বসন্তে যদি রসের প্লাবন নামে ধরণীতে, তাতে তার আমন্ত্রণ নেই। সে-মানুষ হারিয়ে গেছে।

আসলে জীবনের সুখদুঃখের সকল চেতনাই আজ তার কাজে লুপ্ত। বদ্ধ জলের মতো গতিহীন আর স্থির তার মন। বিরক্তি নেই, আসক্তি নেই, দুঃখ নেই, সুখ শান্তি কিছু নেই। তার মনের সকল প্রবৃত্তিকেই জয় ক'রে এতদিনে নিরুদ্বেগ হয়েছিলো সে। স্ত্রীর সঙ্গে শিথিল সম্পর্ক শিথিলতর হয়েছে, স্ত্রীর আসক্তি টাকায়—নাও! যত খুশি নাও!—তার ঈর্ষার বিষে সমস্ত সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলেছে, জ্বলুক। ভাইয়েদের বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে। সীতা বরদাস্ত করতে পারে না এত লোকের ভিড়—হও আলাদা—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, অর্থ— যা তুমি চাও, তাই নাও। ভাইয়েদের বড়োমানুষি অভ্যাস, নিজেদের উপার্জনে তা পোষায় না—গহ্বর পূরণ করে সুশান্ত। কেবল মা মাঝে-মাঝে পুরোনো দিনের মতো বিষণ্ন চোখে কাছে দাঁড়ান—মেনে নিতে পারেন না বৌয়ের কর্তৃত্ব, ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতা—তাকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের প্রাচুর্য—দাঁত দিয়ে তখন ঠোঁট কামড়ায় সুশান্ত—এই স্নেহের ছোঁওয়ায় একটা দোলা লাগে হৃদয়ের মধ্যে—তার পরেই জলের উপর একটি ভাসমান যন্ত্রের মতো আবার সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় সদম্ভে। কিন্তু সব স্থৈর্য আর এতদিনের অর্জিত সকল শক্তি যেন কে হরণ ক'রে নিলো, হঠাৎ কে যেন তাকে আবার স্বপ্ন দেখালো সীমাহীন আকাশের। জীবনের এক অপূর্ব মাধুর্য আবার কে উপলব্ধি করালো নতুন ক'রে। এত ফুল, এত গন্ধ, এত রূপ, এত রস—কে আবার তাকে নিমগ্ন

করলো তার মধ্যে। সব তো মুছে গিয়েছিলো, আবার কেন ঘুম ভাঙলো—আবার কেন ঝংকৃত হ'য়ে উঠলো হৃদয়ের সকল তন্ত্রী—কেন বেজে উঠলো দুর্নিবার সুরের আঘাতে। এ যে বন্যা—এ যে বন্যা। সুশান্ত একেবারে ছটফটিয়ে দিশেহারার মতো দিন কাটাতে লাগলো।

কত মেয়ের পদক্ষেপে তার জীবন কতবার পুষ্পিত হয়েছে, কত মেয়ের চোখের জল তাকে বিচলিত করেছে, তাকে কেন্দ্র ক'রে চলেছে কত পরিভ্রমণ, আর কী নির্লিপ্ততায় সে তা পরিত্যাগ করেছে অনায়াসে—কিন্তু আজ এ কী হ'লো তার। জীবনের মধ্যাহ্নে এসে কার দেখা পেলো। ঐ স্তব্ধ সমুদ্রে কেন এলো এই প্রচণ্ড জোয়ার। মন লাগে না কাজে, কখন কত অসতর্ক মুহূর্তে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে তাঁর নাম—আর অদ্ভুত মধুর এক তীব্র উপলব্ধিতে সারা দেহ-মন অসাড় হ'য়ে যায়।

এমন মানুষকে যে এমন ক'রে জাগালো, সমস্ত জীবনের সব অতৃপ্তিতে যে ঢেলে দিলো এত মধু, যা জানতো না অথচ চাইতো, সেই চাওয়াকে যে রূপ দিলো, সে কে—কোথায় তার বাসা, কেমন সে দেখতে, এ-সব প্রশ্নই অবান্তর। তিনি তিনিই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি একমাত্র। তার সমস্ত তৃষিত অন্তরাত্মার একমাত্র অধীশ্বরী তিনি। এ ছাড়া তাঁর অন্য-কোনো পরিচয় নেই।

তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পরে বুকের মধ্যে যেন ভালোবাসার একটা দুরন্ত স্রোত ওঠা-পড়া করতে লাগলো' দিনরাত্রি। নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় ক'রে দিয়েও তার মনে হ'লো নেই, নেই—কিছু নেই—কিছু নেই দেবার। ঈশ্বর, দাও, আরো দাও, আরো দাও, প্রভু—বুকের উপর দুটি হাত যুক্ত ক'রে রাত্রিতে শুয়ে-শুয়ে সুশান্ত এই প্রার্থনা করলো মনে-মনে।

অবশ্য এই বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠবার অনেক চেষ্টা করেছিলো সে—কিন্তু দৈবের কাছে মানুষের হার চিরকাল চ'লে এসেছে, তা নইলে সঞ্চিত সকল শক্তি কেন গেলো ভেসে? কেন অনিবার্য হ'য়ে উঠলো এই ভালোবাসার আবেগ? একটু দেখা, শুধু দুটি চোখ দিয়ে তাঁকে একটুখানি দেখতে পাওয়া—এ যে তার জীবনে কী, তার ব্যর্থ বিরস কর্মময় জীবনে কতখানি, এ-কথা কাকে বোঝাবে সে। নিজের কাছেই নিজেকে যেন নতুন লাগলো। দীর্ঘদিন ধ'রে সংসারের কত ভার সে নিঃশব্দে একা-একা বহন করেছে, কত ইচ্ছা সে অনায়াসে মিশে যেতে দিয়েছে মনের মধ্যে, কত দুঃখ-ব্যথার জগদ্দল পাথর আজো তো বুকের মধ্যে অসহ্য

যন্ত্রণা তুলে কত দিন কত মুহূর্তকে বিখণ্ডিত ক'রে দেয়। তবে? উত্তর নেই এ-প্রশ্নের।

সুশান্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলো এখানে, দিনগুলো কাটতে লাগলো একটা মূর্ছার মতো, জীবনে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। সমস্ত দিন কাজ, আর কাজের শেষে ক্লান্ত দেহ-মনে বাড়ি ফেরা—এ ছাড়া অন্য প্রয়োজন যার নিবে গিয়েছিলো, সে যেন জ্ব'লে উঠলো সূর্যের মতো। প্রদীপের পোড়া সলতের মতো তার শুকনো বুক আবার স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠলো তেলের প্রাচুর্যে। জীবনে এলো ছুটির প্রয়োজন। আপিশ থেকে শিগগির ক'রে বাড়ি ফেরার তাড়া দেখা দিলো—এমনকি সুযোগ-মতো কামাই করতেও সে দ্বিধা করলো না। সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরার যে একটা ব্যাকুলতা, জীবনে যেন এই সে প্রথম উপলব্ধি ক'রে রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলো। এ যে কী, কত যে আনন্দ, তা কি আর কোনোদিন জেনেছিলো? যদিও এ-বাড়ি তার নয়, এ-বাড়ির যিনি রচয়িতা তিনিও তার কেউ নন—তবু সে-চিন্তা তাকে স্পর্শ করলো না—তাঁকে যে দেখবে, শ্রবণ ভ'রে যে শুনবে তাঁর কোমল কণ্ঠস্বর, প্রসন্ন অভ্যর্থনার আলো নিয়ে তিনি যে আসবেন দ্রুত পায়ে এগিয়ে—এ-চিন্তাই তাকে সকল-কিছুর অতীত ক'রে রাখলো।

শৈশবে পিসিমার আদেশে বাড়ি ফিরতো, স্বেচ্ছায় নয়। সন্ধ্যাবেলা সূর্য যখন এইমাত্র ডুবলো—সমস্ত আকাশে যখন রাত্রির একটা আশ্চর্য কালো ছায়া বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো—সেই সময়টায়, সেই সন্ধিক্ষণটায় তার ইচ্ছা করতো না বাড়ি ফিরতে। চারটি দেয়ালে আবদ্ধ ঐ ছোটো ঘরটিতে ব'সে পাঠ্যপুস্তকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে কতদিন ঝাপসা হ'য়ে এসেছে চোখ, একদিনও বাইরের সেই অস্পষ্ট আকাশকে দু'চোখ ভ'রে সে দেখে নিতে পারেনি। ঘরে ব'সেই সন্ধ্যার কেমন-একটা গন্ধ সে অনুভব করেছে, অথচ প্রাণশক্তিকে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে লণ্ঠনের সেই কেরোসিনের কটু গন্ধে। চরিত্র খারাপ হবে, এই ছিলো পিসিমার ভয়। সূর্যালোক যেন চরিত্রের সতর্ক প্রহরী, আর রাত্রি যেন অধঃপতনের পিছল পথ। কিন্তু মনে-মনে যতই কষ্ট পাক, পিসিমাকে অস্বীকার করার মতো মনের জোর তার ছিলো না। তারপর পিতার মৃত্যুর পরে যে-স্বাধীনতা সে পেলো, তাতে বাড়িতে কিসের একটা ভয়াবহ অনুভূতিই তাকে বিরত করেছে। যতক্ষণ বাইরে থেকেছে ততক্ষণই শান্তি। অতগুলি ক্ষুধিত

মুখের কাছে রিক্ত হস্তে দাঁড়াতে তার ভয় করতো, সারা বাড়িময় যেন একটা দারিদ্র্যের ফিশফিশানি—তাকে দেখলেই যেন তারা কথা ক'য়ে উঠতো। তার উপর ছিলো সকলের কেমন একটা অবোধ অহেতুক দাবি—দেবে না কেন, কেন করবে না, বড়ো হয়েছিলো কেন—মা পর্যন্ত কতদিন তাকে অযোগ্য বলেছেন, তাকে শুনিয়ে, অন্য ছেলেদের বাপ নেই ব'লে তাদের দুরবস্থা বুঝিয়েছেন, কিন্তু তারও যে পিতার অভাবেই সকল ভবিষ্যৎ মুহূর্তে চূর্ণ হ'য়ে গেছে সে-কথা কেউ মনে করেনি। সকলের সব নির্ভরতা শেষ পর্যন্ত যেন কেমন-একটা নিষ্ঠুর দাবিতে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছিলো। কাজেই বাড়ি ফেরার জন্য যে কোনো ব্যাকুলতা আসতে পারে সেটা ছিলো তার স্বপ্ন। তারপর দারিদ্র্যের নাগপাশ এড়িয়ে যখন একটু শান্তির আভাস দেখা দিয়েছিলো জীবনে, মার বিষণ্ণ ব্যথিত চোখে একটা আনন্দের আভা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিলো—ভাই-বোনেদের জড়িয়ে আস্তে-আস্তে গ'ড়ে উঠছিলো এক নতুন জগৎ, এমন দিনেই এলেন স্ত্রী, দারিদ্র্যের অংশ এরা যতই ভোগ ক'রে থাক, ধনের অংশে অংশীদার তো একমাত্র তিনি। হাস্যমুখে সে-কথাটি নিবেদন ক'রে শ্বশুর স্বয়ং এলেন কন্যাকে রাখতে। সংসারে আবার নামলো কালো ছায়া—অভাবের দিনের প্রচ্ছন্ন স্নেহ আবার মার মনে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিলো, স্বাচ্ছন্দ্যের শান্তিতে ভাইবোনেদের শীর্ণ শরীর-মন উজ্জীবিত হয়েছিলো দাদাকে ঘিরে-ঘিরে—কিন্তু স্ত্রী এসে আবার নিঃশেষে মুছে দিলেন সেই শান্তি। স্বামী যে তার—তার বরাতের জোরেই যে আজ সকলে খেতে পাচ্ছে, সে-কথাটা তার মূঢ় মনের উপর পিতা-মাতা খুব ভালো-ভাবেই ছাপ দিয়েছিলেন—সেটা সে ভালো ক'রেই সকলকে উপলব্ধি করালো।
—এই তো তার বাড়ি ফেরার ইতিহাস।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়সমাজ সব থেকেই নিজেকে সে একেবারে নির্বাসিত ক'রে রেখেছিলো, দুঃখের দিনে এদের চিনে নেবার অবকাশ হয়েছিলো তার। কোনো প্রবৃত্তি ছিলো না আর সঙ্গলাভের, কিন্তু জীবনের প্রায় প্রান্তে এসে মরুভূমির মধ্যে এ কী উদ্যান আবিষ্কার করলো সে?

কিন্তু ভালোবাসাও যত, দুঃখটাও কি ততই তীব্র নয়? প্রথমটায় এ-সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অচেতন ছিলো তার মন, মনের মধ্যে এ-কথাটাই তখন বড়ো ছিলো—'এই তো যথেষ্ট, এই যে তাঁকে দেখতে পেলাম, ভালোবাসলাম, যা চেয়েছিলাম সারা জীবন ধ'রে, মূর্তিমতী হ'য়ে সে যে দেখা দিলো, এই কি যথেষ্ট নয়? এমন মধুর, এমন উজ্জ্বল—হৃদয়বৃত্তিতে এমন যিনি পরিপূর্ণ তাঁর কাছে তো নিজেকে

বিকিয়ে দিয়েই সুখ। কী তিনি দিলেন, কী হবে তার হিসাব-নিকাশে। সূর্যের উত্তাপে ফুল ফোটে, পরিপূর্ণ চাঁদ সমুদ্রে জোয়ার আনে—তিনিও তাঁর সংস্পর্শ দিয়ে বিকশিত করলেন আমাকে—আমার প্রাণ-প্রাচুর্যের উৎস হ'য়ে রইলেন।' কিন্তু ক্রমশ মন যেন হাত পাততে চাইলো বিনিময়ের আশায়। কিছুকাল পরে সুশান্ত স্পষ্ট বুঝতে পারলো, যা মানুষের প্রতি নিশ্বাসের কামনার ধন, তাকে পাওয়া ঠিক এ-ভাবে পাওয়া নয়। যৌবনে এই বন্ধুতাই ছিলো তার আদর্শ—মেয়েরা যখন তাকে অন্য ভাবে পেতে চেয়েছে তার অবাক লেগেছে, কিন্তু এতদিনে সে বিশ্বাস করলো সত্যিই সে-পাওয়া পাওয়া নয়, যাকে সত্যি ক'রে চাওয়া যায়, তাকে আরো চাই, আরো নিবিড় ক'রে চাই, সমস্ত দেহ-মন দিয়েই আমরা তাকে প্রার্থনা করি—এবং সুশান্তর দেহমনের এই যে একাগ্র শুচিতা—এ কি সে এই পাওয়াটির জন্যই এতদিন রক্ষা ক'রে এসেছিলো? তার হৃদয় সর্বতোভাবে যা গ্রহণ করতে পারে, তা কি কেবলমাত্র এই মেয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়? যাঁকে একটু ছুঁতে পারলেও সমস্ত জীবন-মন শান্তিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে পারতো, সে-মানুষ কি একমাত্র তিনিই নন? আস্তে-আস্তে এই চেতনা তাকে কেমন একটা অশান্তিতে নিয়ে আসতে লাগলো। কেমন-একটা ব্যর্থ ব্যাকুল কান্নার ঢেউ যেন ক্রমাগত গড়িয়ে-গড়িয়ে ওঠা-নামা করতে লাগলো তার বুকের মধ্যে।

আর তিনি? তিনি তাঁর পরিবেশে শান্ত সমাহিত। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আছে, লোভ নেই, চাইবার আছে, না-পাবার বেদনা নেই। সকলের প্রাণকেন্দ্র হ'য়ে আপন হৃদয়ের মহিমাতেই তিনি মহান। তাঁর বন্ধুতার নিবিড় উত্তাপে এই যে তিনি সুশান্তকে পূর্ণ ক'রে রাখছিলেন, এও তাঁর প্রশস্ত প্রশান্ত হৃদয়েরই একটা প্রকাশ। তিনি কি জানেন না, তিনি কি বোঝেন না—বোঝেন না একটা মানুষ এই যে দিনের পর দিন এমন-একটা ব্যাকুলতা নিয়ে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে-ছুটে আসে, সে কিসের জন্য? তিনি কি কিছুই বোঝেন না? সুশান্তর ঘন পল্লবে ঘেরা বড়ো-বড়ো চোখের দুটি কালো মণিতে কী লেখা আছে, কখনো কি তিনি তা পড়েননি? হয়তো ভালোবাসা যে কোথায় কত উঁচুতে উঠতে পারে, এই আবেগকে তিনি সেখানেই তুলে দেবার সহায়তা করেন। তাঁর অসীম নিথরতা হয়তো এ-কথাটাই জানাতে চায় যে অস্তিত্বটা কিছু নয়, সেটা ফাঁকা—আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, সেটাই চরম, সেটাই সব। সেখানে যাও, সেখানেই শান্তি, সেখানেই মানুষের বঞ্চিত হৃদয়ের পরম আশ্বাস।

সুশান্ত ভাবতে পারে না, প্রাণ-মন অস্থির হ'য়ে ওঠে। কী হবে, কী হবে—এর পর কী—এ-ক'টি কথা তাকে অবিরাম শ্রান্ত-ক্লান্ত ক'রে ফেলে—সে যেন চূর্ণ হ'য়ে যায় একটা ব্যর্থ ভালোবাসার গুরু ভারে। তিনি যত্ন করেন, ভালোবাসেন—অবসরের সময়গুলোকে ভরিয়ে রাখেন নিজের অস্তিত্ব দিয়ে—কিন্তু এ কতটুকু! এ-বাড়িটা যেন তারও বাড়ি, এমনিভাবে ব্যবহার করেন তিনি—মিশিয়ে নেন নিজেদের সঙ্গে। সংকোচ করবার অবকাশ নেই, আবার ভয় নেই, ছোটো হবার আশঙ্কা নেই—কিন্তু তাঁকে পাবার অনতিক্রম্য বাধারও তো ক্ষয় নেই কোনোদিন। নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে সুশান্তর। মনকে একাগ্র করে ছবির রেখায়, ভুলে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—এক সময়ে তাকিয়ে দেখে, কাগজভরা এ কার মুখ? এতক্ষণকার সকল শক্তির সমাধি দিয়ে এ সে কী সৃষ্টি করেছে? দুই চোখ ঝাপসা হয়—সকল শক্তিকে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ছড়িয়ে ফেলে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। কেমন ক'রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জানে না—একটি অতি আকস্মিক মূর্তির আকর্ষণ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে কেবল।

মনের যখন এ-রকম একটা উদ্দাম অবস্থা—সেই সময়ে একদিন প্রবলধারায় বৃষ্টি নামলো। চারদিক অন্ধকার ক'রে দিলো কালো মেঘ। আপিশের বন্ধ দরজার কাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সুশান্ত। কী মনে হ'লো, কী মনে করলো, দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এলো রুদ্ধশ্বাসে। রাস্তায় জল জ'মে গেছে এতখানি—ট্র্যাম নেই, বাস্ নেই, একটা ট্যাক্সি, একটা রিকশ—সব যানবাহন অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটা প্রাণীর সাড়া পর্যন্ত মেলে না, এই ঝাপসা পৃথিবীতে সেই প্রবল বর্ষণ মাথায় ক'রে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করলো দক্ষিণ দিকে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ বেয়ে-বেয়ে নামতে লাগলো জলের ধারা।

সেই বৃষ্টিস্নাত অদ্ভুত এক মূর্তি নিয়ে তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম ক'রে যখন সে এসে পৌছলো তাঁর দরজায়—কেউ দেখলে হয়তো আঁৎকে উঠতো। দরজায় আস্তে হাত রাখতেই ভেজানো দরজা খুলে গেলো। নিস্তব্ধ নিঃশব্দ বাড়ি। বসবার ঘরটায় ঢুকে একটু থমকে দাঁড়ালো—কারো সাড়া পাওয়া গেলো না। শোবার ঘরের নীল পরদাটা ঈষৎ আন্দোলিত হ'লো হাওয়ায়—দেখা গেলো এক রাশ কালো লম্বা চুল মেলে দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন খাটে। বাদামি রংয়ের একখানা শাড়ির আঁচল খ'সে পড়েছে—হাতের আঙুলে পেজ-মার্ক করা একখানা বই প'ড়ে আছে পাশে।

গভীর নিদ্রায় মগ্ন তিনি। সুশান্ত একটু ভাবলো না, সেই জলসিক্ত দেহে ঢুকলো এসে শোবার ঘরে—কাছে, একেবারে খুব কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপর ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়ালো আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে—পরমুহূর্তেই শিহরিত হ'য়ে দু'পা পিছিয়ে গেলো। এ কী! এ সে কী করতে যাচ্ছিলো? এই স্থূল শরীরটার কি এতই ক্ষমতা যে তাকে হার মানতে হবে সেখানে? যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার হৃদয়ের অপার্থিব সম্পদ, তাঁকে আমি নামাবো এই পৃথিবীর ধুলো-মাটিতে! সমস্ত শক্তি সে একাগ্র করলো হাতের মুঠোয়—দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে যেন সে পিষে ফেললো তার চাপে—তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই আর নিজেকে—সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে শেষ বারের মতো একবার দাঁড়ালো, তাকিয়ে রইলো খোলা শক্ত কাঠের দরজার দিকে—তারপর বৃষ্টির জলে আর চোখের জলে মেশা একটা বিস্বাদ জলধারা গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে।

সহসা ঘুম ভেঙে গেলো ভদ্রমহিলার। কেমন-যেন একটা বিচ্ছেদের কষ্টে ভ'রে উঠলো মন—কে যেন চ'লে গেলো, কে যেন মুছে গেল জীবন থেকে—কে? কে? দুই চোখ মেলে রেখে তিনি খুঁজতে লাগলেন তাকে—অনুভব করলেন, যা গেলো তা আর আসবে না তাঁর জীবনে। অকারণে তাঁর চোখও জলে ভ'রে উঠলো।